লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

প্রকাশনার ১০০ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নবপর্যায় ৮৫ বর্ষ | ১ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩১ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ | ১৫ জিলহজ্জ, ১৪৪৩ হিজরি | ১৫ ওফা, ১৪০১ হি. শা. | ১৫ জুলাই, ২০২২ ঈসাব্দ

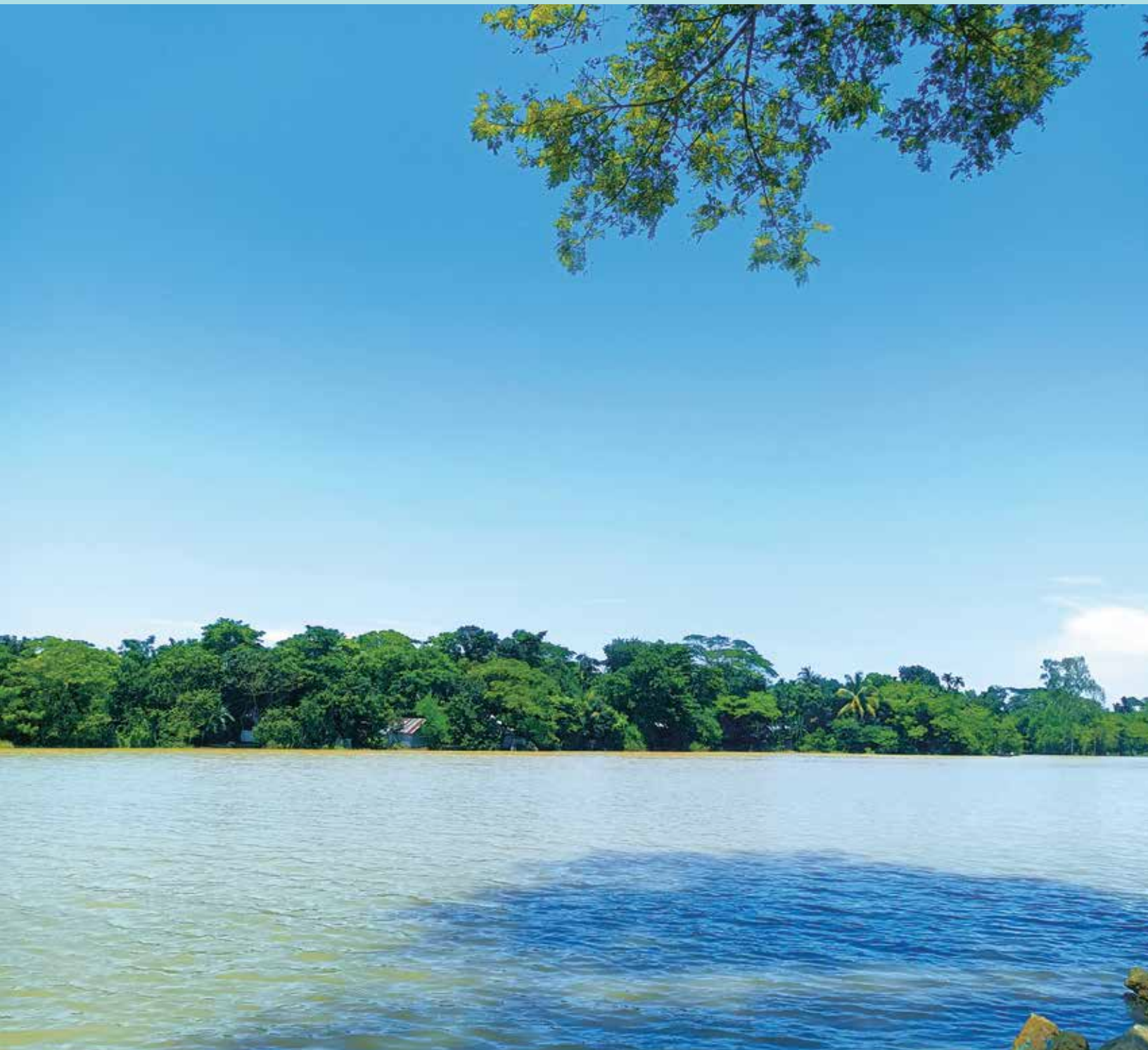

গায়ের আহমদী বিবাহের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাবধান বাণী

খোদা তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে আমাদের জামা'তের সদস্য সংখ্যা যেহেতু অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে আর বর্তমানে তা হাজার হাজারে গিয়ে উপনীত হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তা অচীরেই লক্ষ-তে পৌছে যাবে। (এখন আল্লাহ্‌র কৃপায় তা কোটিতে উপনীত হয়েছে) তাই হিকমত ও প্রজ্ঞার দাবি হল, এদের পারস্পরিক ঐক্য বৃদ্ধি করার জন্য, এবং এদের পরিবার পরিজন আর আত্মীয় স্বজনের মন্দ বা কুপ্রভাব থেকে আর মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা করার জন্য ছেলে-মেয়েদের বিবাহের বিষয়ে কোন উত্তম ব্যবস্থাপনা থাকা প্রয়োজন।

এ কথা স্পষ্ট, যারা বিরোধী মৌলবীদের প্রভাবে বা ছত্রছায়ায় বিদ্বেষ, হিংসা আর কার্পণ্য এবং শত্রুতার চরম সীমায় উপনীত, যতদিন তারা তওবা করে এই জামা'তে অন্তর্ভূক্ত না হয়, ততদিন তাদের সাথে আমাদের জামা'তের সদস্যদের নতুন বৈবাহিক সম্বন্ধ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আর এ জামা'ত সম্পদে, জ্ঞানে, কল্যাণে, বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে, পুণ্যের দিক দিয়ে কোন ক্ষেত্রেই এখন তাদের মুখাপেক্ষী নয়, এমনকি তাকওয়া পরায়ণ অসংখ্য লোক এ জামা'তে বিদ্যমান। আর প্রত্যেক ইসলামী গোষ্ঠীর লোক এ জামা'তে অন্তর্ভুক্ত আছে। এ ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই আমাদের জামা'তের সদস্যদের এমন কারও সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে জড়ানো সমীচীন হবে না– যারা আমাদেরকে কাফের বলে, আমাদেরকে দাজ্জাল বলে আখ্যা দেয় অথবা নিজেরা না বললেও এমন বক্তব্য প্রদানকারীদের গুণগান করে এবং তাদের অনুগামী।

স্মরণ রাখবেন! যারা এমন লোকদের পরিত্যাগ করতে না পারে, তারা আমাদের জামা'তে অন্তর্ভুক্তির যোগ্য নয়। যতদিন পর্যন্ত পবিত্রতা ও সত্যের জন্য এক ভাই নিজ ভাইকে পরিত্যাগ করতে না পারে, পিতা নিজ পুত্র থেকে পৃথক হতে না পারে, ততদিন পর্যন্ত তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। অতএব সমস্ত জামা'ত মন দিয়ে শুনুন! সত্যনিষ্ঠ হবার জন্য এ শর্ত মানা আবশ্যক।

(মজমুআয়ে ইশতেহারাত, তৃতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা: ৫০-৫১)

সম্পাদকীয়

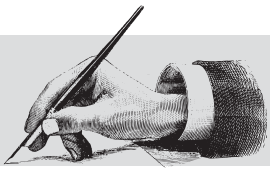

পবিত্রভাষী ব্যক্তিই মানুষের মন জয় করতে পারে

বেশ কিছুদিন পূর্বে ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল বিজেপির মুখপাত্র নূপুর শর্মা এবং বিজেপির অপর নেতা মি. জিন্দাল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্য করে। বিশেষকরে নূপুর শর্মা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যে মন্তব্য করে তা বেশ আক্রমণাত্মক এবং অবমাননাকর। তাই এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে না। তাদের এমন কৃতকর্মের পরপরই বিভিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে মুসলমানদের মাঝে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মুসলিম জাতি কখনও মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে কটুক্তি সহজে মেনে নেয় নি আর নিবেও না– এটাই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন,

"মুসলমানরা এমন এক জাতি যারা তাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর সম্মানার্থে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দেয়। তাদের রসূল (সা.)-কে দিবানিশি গালি দেয়া যাদের পেশা, যারা নিজেদের পত্র-পত্রিকা, বইপুস্তক ও বিজ্ঞাপনসমূহে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সাথে তাঁর নাম উল্লেখ করে এবং তাঁর জন্য চরম নোংরা শব্দ ব্যবহার করে তাদের সম্বন্ধে সুধারণা পোষণ করা ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করার মত অসম্মান অপেক্ষা মৃত্যুবরণ করাকে মুসলমানরা শ্রেয় মনে করে। স্মরণ রাখবেন! এমন লোকেরা স্বজাতিরও শুভাকাঙ্খী নয়। কেননা তারা তাদের চলার পথে অন্তরায়। আমি সত্য সত্যই বলছি, আমাদের পক্ষে জঙ্গলের সাপ ও মরুভূমির হিংস্র জন্তুর সাথে সন্ধি করাও সম্ভব কিন্তু আমরা এমনসব মানুষের সাথে আপোষ করতে পারি না যারা আল্লাহ্‌র নবীদের সম্পর্কে অবমাননাকর বক্তব্য দেয়া হতে ক্ষান্ত হয় না। তারা মনে করে, গালমন্দ করা ও অকথ্য ভাষা ব্যবহারের মাঝে বিজয় নিহিত। বস্তুতঃ সকল বিজয় উর্ধ্বলোক থেকেই এসে থাকে। পবিত্রভাষী মানুষেরা অবশেষে তাদের পবিত্র ভাষণ ও কথনের কল্যাণে মানুষের মন জয় করে থাকে। কিন্তু নোংরা স্বভাবের লোকেরা দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে বিভেদ ও বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোন কৌশল জানে না। অভিজ্ঞতাও এ কথাই বলে, নোংরা ভাষী মানুষের পরিণাম শুভ হয় না আর অবশেষে আল্লাহ্‌র আত্মাভিমান তাঁর প্রিয়জনদের পক্ষে কার্যকর হয়।" *(চশমায়ে মা'রেফাত, রূহানী খাযায়েন, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, পৃ. ৩৮৫-৩৮৭)*

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন, "যুগ-ইমামের কথা স্মরণ রাখুন! প্রতিটি বিজয় উর্ধ্বলোক থেকে প্রদান করা হয়। উর্ধ্বলোকে সিদ্ধান্ত হয়েই আছে আর তা হল, তোমরা যে রসূল (সা.)-এর মানহানির অপচেষ্টা করছ, তিনি (সা.) অবশ্যই এ পৃথিবীতে বিজয় লাভ করবেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী এ বিজয় মানুষের মন জয়ের মাধ্যমে অর্জিত হবে কেননা পবিত্র কথা ও বাণীতে এক প্রকার জাদু রয়েছে। পবিত্র বাণী ও বচনের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের দরকার নেই আর জঘন্য কথার উত্তর নোংরা ভাষায় দেয়ারও প্রয়োজন নেই। এসব লোক যেসব অশালীন ও কটুকথা বলতে আরম্ভ করেছে, তা অচিরেই বন্ধ হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ্। আর ইহজীবনের অবসানে এসব লোককে আল্লাহ্ তা'লা শাস্তি দিবেন।" *(খুতবা জুমুআ, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১২)*

অতএব আমরা যারা মহানবী (সা.)-এর উম্মত হিসেবে নিজেদেরকে দাবি করি, আমাদের প্রথম ও প্রধানতম দায়িত্ব হল, মহানবী (সা.)-এর আদর্শ নিজে ধারণ করে তা লোকদের সম্মুখে উপস্থাপন করা। তাদের গালির বিপরীতে উত্তম আচরণের মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর সম্মান প্রতিষ্ঠা করা। মিছিল-মিটিং করে জনগণের ভোগান্তির কারণ সৃষ্টি করা মহানবী (সা.)-এর শিক্ষার পরিপন্থী। তাই আমাদের প্রতিবাদ যেন হয় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সম্মান বৃদ্ধির কারণ। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে এর সৌভাগ্য দিন।

সূচিপত্র

১৫ জুলাই ২০২২

পবিত্র কুরআন ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃতবাণী ৫

১৮ মার্চ, ২০২২ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **জুমুআর খুতবা** ৬
বিষয়: ***হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর স্মৃতিচারণ***

২৫ মার্চ, ২০২২ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **জুমুআর খুতবা** ১৭
বিষয়: ***মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস***

বিবাহের সময় হযরত আয়েশা (রা.)-এর বয়স কত ছিল? ২৮
ভাবানুবাদ: মাওলানা নাভিদুর রহমান, মুরব্বী সিলসিলা

প্রেস বিজ্ঞপ্তি: ৩১
আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, নাইজেরিয়া

প্রচ্ছদ পরিচিতি:
"মনাই নদী"
সেলবরষ, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ (*ফটো ক্রেডিট: শরীফ আহমদ*)

'আহমদী' পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র **'আহমদী'** পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিকনির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার সম্পাদক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর– **সম্পাদক**, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

কুরআন শরীফ

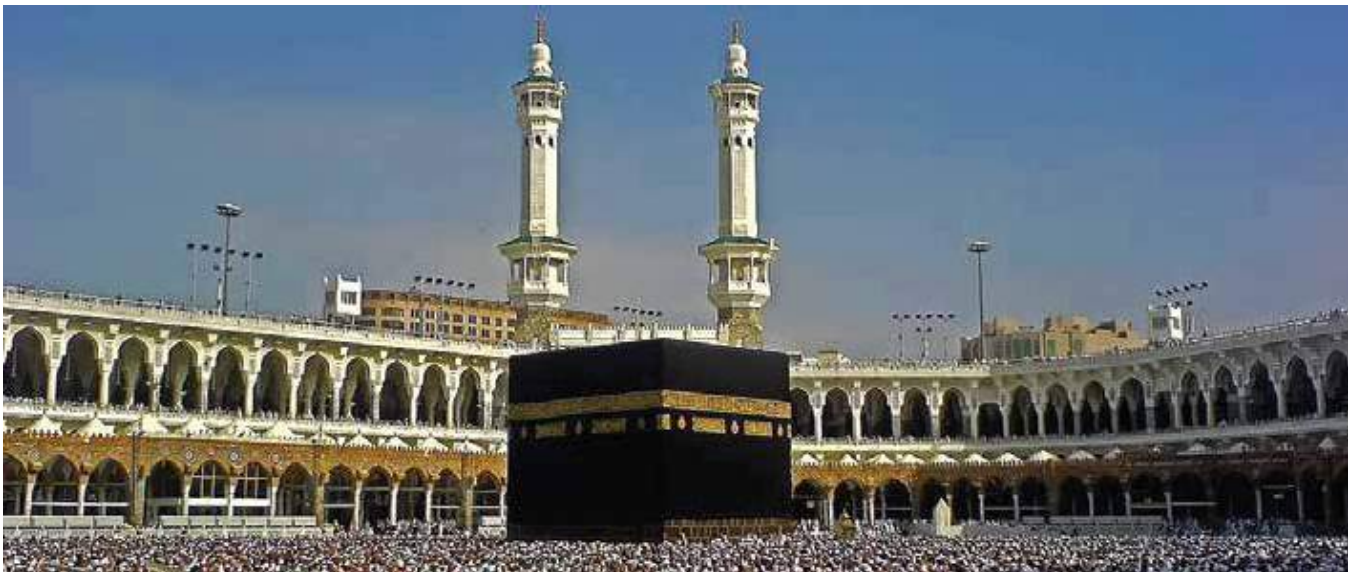

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ○ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ○ *(সূরা আল্ আহযাব: ৫৭-৫৮)*

অনুবাদ: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতারাও এ নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করছেন। হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করো এবং তাঁর জন্য বেশি বেশি করে শান্তি কামনা করো। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেছেন এবং তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, রসূলে আকরাম (সা.)-এর আমল বা কর্ম এমন ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা সেগুলোকে সংজ্ঞায়িত করা বা সেগুলোর বৈশিষ্ট্যকে সীমাবদ্ধ করার নিমিত্তে কোন শব্দ নির্দিষ্ট করেন নি।... অর্থাৎ তাঁর (সা.) সত্তায় সেই সততা ও বিশ্বস্ততা বিদ্যমান ছিল এবং তাঁর কর্ম খোদার দৃষ্টিতে এতটাই পছন্দনীয় ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা চিরকালের জন্য এই আদেশ দিয়ে দিলেন যে, আগামীতে তোমরা কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ দরূদ প্রেরণ করবে। তাঁর (সা.) দৃঢ় মনোবল, সততা এবং বিশ্বস্ততার কতটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব তাঁর অনুসারীদের ওপর পড়েছিল! একজন বিপথগামী মানুষকে সংশোধন করা কতটা কঠিন কাজ তা প্রত্যেকেরই জানা। বদ্ধমূল বদঅভ্যাস পরিত্যাগ করানো কত-না অসম্ভব একটি বিষয়! অর্থাৎ, যে বদঅভ্যাস পোক্ত হয়ে যায় তা ত্যাগ করা খুব কঠিন। কিন্তু আমাদের পবিত্র নবী (সা.) তো হাজার হাজার এমন মানুষকে সংশোধন করেছেন যারা ছিল পশুর চেয়েও অধম। অর্থাৎ, অনেকে পশুর মত মা-বোনের মধ্যে কোন পার্থক্য করত না। এতীমদের সম্পদ আত্মসাৎ করত আর মৃত ব্যক্তির সম্পদ হরণ করত। কেউ কেউ ছিল নক্ষত্রপূজারি, কেউ ছিল নাস্তিক আবার কেউ ছিল প্রাকৃতিক শক্তির পূজারি। আরব উপদ্বীপ ছিল সকল ধর্মের এক সমাহার স্থল। এর ফলে সবচেয়ে বেশি যে সুবিধা হয়েছিল তা হল, পবিত্র কুরআনের মাঝে এক ধরনের শিক্ষা পুঞ্জিভূত রয়েছে যা সকল ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মন্দ শিক্ষার মূলোৎপাটনের জন্য যথেষ্ট। এটি হল আল্লাহ্ তা'লার গভীর প্রজ্ঞা ও পরিকল্পনা।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেন, "প্রকৃতপক্ষে মানুষ হল বান্দা অর্থাৎ দাস। মালিক যে আদেশ দিবে তা পালন করাই হচ্ছে দাসের কাজ। একইভাবে তোমরা যদি মহানবী (সা.)-এর কল্যাণ লাভ করতে চাও তবে তাঁর দাসত্ব বরণ করো। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাযীনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম' [অর্থাৎ, তুমি বল, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের প্রাণের ওপর অবিচার করেছ *[(সূরা আয্ যুমার: ৫৪)– অনুবাদক]*। এখানে 'বান্দা' শব্দটি সৃষ্টিকুল অর্থে নয় বরং দাস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর দাস হবার জন্য আবশ্যক হল, তোমরা তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ প্রেরণ করো এবং তাঁর (সা.) কোন আদেশ অমান্য কোরো না আর তাঁর সকল আদেশ জীবনে বাস্তবায়ন করো।"
(আল বদর, দ্বিতীয় খণ্ড, সংখ্যা: ১৪, ২৪ এপ্রিল-১৯০৩, পৃ: ১০৯)

হাদীস শরীফ

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً

(সহীহ্ তিরমিযী, কিতাবুস্ সালাত, বাব মা জাআ ফি ফাযলিস্ সালাতি আলান্ নাবি (সা.), হাদীস নং ১৬৬৩)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সা.) বলেন, "কিয়ামতের দিন লোকদের মাঝে সে ব্যক্তিই আমার সবচেয়ে নিকটে থাকবে, যে আমার প্রতি সর্বাধিক দরূদ প্রেরণকারী হবে।"

আব্দুর রহমান বিন আবি লায়লা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমার সাথে কা'ব বিন আজরাহ (রা.)-এর সাক্ষাত হয় আর তখন তিনি (রা.) বলেন, আমি কি তোমাকে মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে শোনা একটি কথা উপহারস্বরূপ বলব না? আমি বললাম, অবশ্যই আপনি আমাকে এ উপহার দিন। তখন তিনি (রা.) বলেন, আমরা একবার রসূলে করীম (সা.)-এর নিকট নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা আপনাদের অর্থাৎ আপনার পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি কীভাবে দরূদ প্রেরণ করব? সালাম দেয়ার পদ্ধতি তো আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে শিখিয়েছেন কিন্তু দরূদ প্রেরণের পদ্ধতি আমরা জানি না। তখন মহানবী (সা.) বললেন, তোমরা এমনটি বল যে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদীন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদীন কামা সাল্লাইতা 'আলা ইব্রাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদীন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদীন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। *[তিরমিযী, কিতাবুস্ সালাত, বাব মা জাআ ফি সিফাতিস্ সালাতি আলান্ নাবিয়্যি (সা.)]*

অর্থ: হে আমার আল্লাহ্! অনুগ্রহ বর্ষণ করো মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর অনুগামীদের প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ তুমি বর্ষণ করেছিলে ইব্রাহীম (আ.) এবং তাঁর অনুগামীদের উপর। নিশ্চয়ই তুমি মহাপ্রশংসিত ও মহামর্যাদাবান। হে আমার আল্লাহ্! তুমি কল্যাণ বর্ষণ করো মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ও তাঁর অনুগামীদের প্রতি যেরূপ তুমি কল্যাণ বর্ষণ করেছিলে ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি মহাপ্রশংসিত এবং মহামর্যাদাবান।

আরেকটি হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, "আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করো। কেননা আমার জন্য দরূদ পাঠ তোমাদের নিজেদের পবিত্রতা অর্জন এবং উন্নতির কারণ হবে।" *[জালাইল ইফহাম বিহাওয়ালিহি কিতাব সালাতু আলান্ নাবিয়্যি (সা.) ইসমাঈল ইবনে ইসহাক]*

অতএব কে আছে যে, পুণ্য ও পবিত্রতার ক্ষেত্রে উন্নতি করতে চায় না? আমাদের প্রতি অনুগ্রহকারী এবং আমাদের মনিব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) আমাদেরকে এই পথ দেখিয়েছেন যে, তোমরা আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করো। কেননা আমার জন্য দরূদ পাঠ তোমাদের নিজেদের পবিত্রতা অর্জনের কারণ হবে। কিন্তু কেবল দরূদ পাঠ করলেই কি উন্নতির সকল স্তর অতিক্রান্ত হবে? কিছু মানুষকে আপনারা দেখবেন, তসবীহ্ গুণতে থাকে আর বলে, আমরা আল্লাহ্‌র যিকর করছি। তারা এত দ্রুত তসবীহ্‌র দানা গুণতে থাকে যে, সেই সময়ের ভেতর দরূদ শরীফ পড়াই যায় না বরং কোন যিকরই করা সম্ভব নয়। তাদের এই অবস্থা দেখে মন অস্থির হয়ে যায় যে, এরা কীভাবে দরূদ পড়ছে? এরা কেমন মানুষ যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর নাম জপছে! কিছু মানুষের মনে কখনও কখনও প্রশ্নও জাগে যে, তাদের বাহ্যিক কর্ম অর্থাৎ তসবীহ্ গুণতে থাকা এবং তাদের প্রকৃত দৃশ্যমান অবস্থার মাঝে এত বিরোধ কেন? বর্তমান যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ বিষয়টির সমাধান দিয়েছেন আর আমরা আহমদীরা খুবই সৌভাগ্যবান যে, যুগ-ইমামকে চেনার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে।

অমৃতবাণী

দুনিয়ার স্বাদের উপমা

দুনিয়ার স্বাদের উপমা চুলকানির ন্যায়। শুরুতে স্বাদ বা আরাম লাগে। অতঃপর সে যখন চুলকাতে থাকে তখন ক্ষত হয়ে সেখান থেকে রক্ত বের হয়। এমনকি সেখানে পুঁজ হয় এবং সেটি ভগন্দরের মত হয়ে যায়। আর এতে ব্যথাও শুরু হয়ে যায়। প্রকৃত বিষয় হল, এ জগত ক্ষণস্থায়ী এবং অবাস্তব। আমার বহুবার মনে হয়েছে যে, যদি আল্লাহ্ তা'লা কোনো মৃত ব্যক্তিকে এই ক্ষমতা দিয়ে দেন যে, সে পুনরায় এই পৃথিবীতে চলে আসবে তখন সে অবশ্যই তওবা করে বলবে আমি এই দুনিয়া থেকে পরিত্রাণ চাই। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমেই মানুষ এই জগতের সমস্যাবলী থেকে মুক্তি পেতে পারে কেননা আল্লাহ্ তা'লা ব্যথিতদের দোয়া কবুল করে থাকেন। কিন্তু এর জন্য শর্ত হচ্ছে, মানুষ যেন দোয়া করে ক্লান্ত না হয়, তবেই সে সফল হবে। কিন্তু যদি সে ক্লান্ত হয়ে যায় তবে শুধুমাত্র অকৃতকার্যতাই নয় বরং সাথে ঈমানহীন প্রতীয়মান হবে কেননা সে খোদা তা'লা সম্বন্ধে মন্দ ধারণার ফলে ঈমান হারিয়ে ফেলবে। যেমন, এক ব্যক্তিকে যদি বলা হয় যে, তুমি এই জমিন খনন করো কেননা এথেকে গুপ্তধন বের হবে। সেই ব্যক্তি যদি দুই, চার বা পাঁচ হাত খনন করার পর খনন করা ছেড়ে দেয় এবং দেখে যে, গুপ্তধন বের হয় নি তবে সে এই অকৃতকার্যতা এবং অসফলতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং যে ব্যক্তি এ বিষয়ে তাকে বলেছিল, তাকেও গালিগালাজ করবে। অথচ এটি তার নিজের দুর্বলতা এবং নিজের ভুল কেননা পুরোপুরি খনন করে নি। ঠিক একইভাবে মানুষ যখন দোয়া করে ক্লান্ত হয়ে যায় তখন তার অকৃতকার্যতাকে নিজের দুর্বলতা এবং অবহেলা মনে করে না বরং সে খোদা তা'লা সম্পর্কে মন্দ ধারণা করতে শুরু করে এবং পরিশেষে বেঈমান বা ঈমানশূন্য হয়ে যায়। আর সবশেষে নাস্তিক হয়ে মারা যায়।

একদা মহানবী (সা.) বসা ছিলেন এবং সেখানে একটি আম গাছ ছিল এবং উক্ত গাছে কাঁচা আম ছিল। তিনি (সা.) সেটিকে দেখে বলেছিলেন: "দেখো! এই আম গাছে ফল আছে কিন্তু সেটি কাঁচা ফল। যদি কেউ সেটিকে খাওয়া শুরু করে এবং এটিকেই ফলের প্রকৃত স্বাদ মনে করে তাহলে তার অভিজ্ঞতা এখানেই আটকে থাকবে, প্রকৃত স্বাদ সে উপলব্ধি করতে পারবে না। একইভাবে অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী- এ প্রবাদটিও যথাযথ। নিজ গন্তব্যে পৌঁছতে না পারাও কাঁচা ফল ভক্ষণের ন্যায়। তারা এ বিষয়ে যাকেই বলবে, তাকেই পথভ্রষ্ট করবে আর সে নিজের ক্ষেত্রে এমনটি করলে নিজেও পথভ্রষ্ট হবে।"
(মালফুযাত, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ২৩-২৪)

১৮ মার্চ, ২০২২ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

বিষয়:
হযরত আবু বকর (রা.)-এর স্মৃতিচারণ

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর জীবনচরিতের আলোচনায় যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিষয়ে তার ধ্যানধারণা এবং তাদের সাথে তার ব্যবহার সম্পর্কে উল্লেখ করা হচ্ছিল। এ বিষয়ে ইতিহাসগ্রন্থ তাবারিতে যে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় তা হল, কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া আসাদ ও গাতফান এবং তার গোত্রের সকল লোক নবুয়্যতের মিথ্যাদাবিদার তুলায়হা বিন খুয়ায়লেদের হাতে একত্র হয়ে যায়। আসাদ গোত্রের লোকেরা সামীরা নামক স্থানে সমবেত হয়। আদ জাতির এক ব্যক্তির নামে এই জায়গার নাম সামীরা রাখা হয়েছে, যা মক্কা যাওয়ার পথে অবস্থিত। এই অঞ্চলের আশপাশে কৃষ্ণবর্ণের পাহাড় রয়েছে, এই নামকরণের এটিও এটি কারণ। ফাযারা এবং গাতফান গোত্রের লোকেরা নিজেদের সমর্থকদের সাথে তিবার দক্ষিণে জমায়েত হয়। তায় গোত্রের লোকেরা নিজ অঞ্চলের সীমান্তে সমবেত হয়। সা'লাবা বিন সা'দ, মুর্‌রা এবং আবাস গোত্র হতে তাদের সমর্থকরা রাবাযার আবরাক নামক স্থানে সমবেত হয়। রাবাযাও মদিনা থেকে তিন দিনের দূরত্বে অবস্থিত মদিনার উপত্যকাগুলোর মাঝে একটি উপত্যকা। আবরাকুয্ যাবাদাহ জায়গাটি বনু যুবইয়ান গোত্রের স্থানগুলোর অন্তর্গত ছিল। বনু কিনানার কিছু লোকও এদের সাথে এসে যুক্ত হয়, কিন্তু সেই এলাকায় তাদের সংকুলান সম্ভব

হয় নি, যে কারণে তারা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি দল আবরাকে অবস্থান করে আর অপরটি যুল কাস্‌সায় চলে যায়। যুল কাস্‌সাও মদিনা থেকে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি জায়গা। তুলায়হা তাদের সাহায্যকল্পে হিবালকে প্রেরণ করে। হিবাল ছিল তুলায়হার ভ্রাতুষ্পুত্র। যাহোক, এভাবে হিবাল যুল কাস্‌সায় অবস্থানকারীদের নেতা হয়ে যায় যেখানে আসাদ, লায়স, বীল ও মুদলেজ গোত্র হতে তাদের সমমনারা উপস্থিত ছিল। অওফ বিন ফুলান বিন সিনান আবরাকে অবস্থিত মুর্‌রা গোত্রের নেতা নিযুক্ত হয় আর সা'লাবা ও আবাস গোত্রের নেতা নিযুক্ত হয় হারেস বিন ফুলান, যে ছিল বনু সুবায়ের সদস্য। এসব গোত্র নিজ নিজ প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে যারা মদিনায় একত্র হয়, অর্থাৎ এরা একত্র হয়ে প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ প্রতিনিধিদল প্রস্তুত করে প্রেরণ করে। তারা এসে মদিনার গণ্যমান্যদের কাছে ওঠে। হযরত আব্বাস (রা.) ছাড়া বাকি সবাই তাদেরকে নিজ বাড়িতে আতিথেয়তা করে এবং তাদেরকে তারা হযরত আবু বকর (রা.)-এর সকাশে এই প্রস্তাবসহ নিয়ে আসেন যে, এরা নামায পড়বে কিন্তু যাকাত দিবে না। আল্লাহ্ তা'লা হযরত আবু বকর (রা.)-কে সত্য ও ন্যায়ের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এরা যদি এই উট বাঁধার রশিও না দেয় তাহলেও তাদের বিরুদ্ধে আমি জিহাদ করব। হযরত আবু বকর (রা.)-এর দৃঢ় অবস্থান দেখে যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের দলগুলো যখন মদিনা থেকে ফিরে যাচ্ছিল তখন তাদের অবস্থা কীরূপ ছিল তার উল্লেখ করতে গিয়ে এক জীবনীকার লিখেন,

হযরত আবু বকর (রা.)-এর দৃঢ় সংকল্প দেখার পর এই প্রতিনিধি দলগুলো মদিনা থেকে ফিরে যায়। কিন্তু যাবার সময় দুটি কথা তাদের মাথায় ছিল। প্রথমত যাকাত না দেয়ার বিষয়ে কোন আলোচনা সফল হবার নয়। এ বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা সুস্পষ্ট আর খলীফার নিজ মতামত ও দৃঢ় অবস্থান থেকে পিছু হটার কোন আশা নেই। বিশেষ করে দলিলপ্রমাণ সুস্পষ্ট হওয়ার পর মুসলমানরা যখন তার সাথে সহমত আর তারাও হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাহায্য ও সমর্থনে বদ্ধপরিকর। দ্বিতীয়ত তাদের (অলীক) ধারণা অনুসারে মুসলমানদের দুর্বলতা এবং সংখ্যাস্বল্পতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মদিনায় প্রবল আক্রমণ করা উচিত যাতে ক্ষমতার অবসান ঘটে। অর্থাৎ তাদের (অলীক) ধারণা ছিল আমরা যদি এমনটি করি তাহলে এভাবে আমরা (মদিনা) করায়ত্ব করে নিব। যাহোক, এই (প্রতিনিধি দলের) লোকেরা ফেরত গিয়ে নিজ নিজ গোত্রসমূহকে বলে এখন মদিনার লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম, অর্থাৎ তাদেরকে (মদিনা) আক্রমণ করার জন্য উস্কানী দেয়। অপরদিকে হযরত আবু বকর (রা.)ও এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। তিনি সেই প্রতিনিধি দল চলে যাবার পর মদিনার সকল চৌকিতে রীতিমতো প্রহরী মোতায়েন করেন। হযরত আলী (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.), হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.)-কে এই কাজে নিযুক্ত করা হয়। এক বর্ণনায় হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) ও হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.)-এর নামও উল্লেখ রয়েছে যে, তাদেরকেও চৌকিতে পাহারায় নিযুক্ত করা হয়। এছাড়াও হযরত আবু বকর (রা.) সকল মদিনাবাসীকে মসজিদে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দেন। এরপর তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, এ ভূখণ্ডের সবাই কাফির হয়ে গেছে আর তাদের প্রতিনিধিদল তোমাদের সংখ্যাস্বল্পতা দেখে গেছে এবং তোমরা জান না তারা দিনে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবে নাকি রাতে। তাদের সবচেয়ে নিটবর্তী দলটি এক বারীদ দূরে অবস্থান করছে, অর্থাৎ বারো মাইল, এক বারিদ সমান বারো মাইল হয়ে থাকে। কিছু লোক চাইত, আমরা তাদের শর্তসমূহ মেনে নিয়ে তাদের সাথে সমঝোতা করে নিই, কিন্তু আমরা তাদের কথা মানি নি, বরং তাদের প্রস্তাবনা নাকচ করে দিয়েছি। যাহোক, এখন শত্রুর মোকাবিলার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করো। হযরত আবু বকর (রা.)-এর ধারণা পুরোপরি সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। আর যাকাত প্রদানে অস্বীকারীদের প্রতিনিধিদল মদিনা থেকে ফেরত যাওয়ার পর কেবল তিন রাতই অতিবাহিত হয়েছিল আর (এরপর) রাত নামতেই তারা মদিনার ওপর আক্রমণ করে বসে। তাদের একটি দলকে তারা যু-হিস্‌সায় রেখে আসে যেন তারা প্রয়োজনের সময় শক্তি যোগানোর কাজে আসতে পারে। যু-হিস্‌সা বনু ফাযারার একটি ঝরনা আর এটি রাবাযা ও নাখলার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। যাহোক এই আক্রমণকারীরা রাতের আধারে মদিনার নিরাপত্তা চৌকিগুলোর কাছে পৌঁছে যায় যেখানে আগে থেকেই সৈন্য মোতায়েন করা ছিল, তাদের পেছনে আরও এমন কিছু লোক ছিল যারা উঁচুতে আরোহণ করছিল। নিরাপত্তারক্ষীরা তাদেরকে শত্রুদের হামলা সম্পর্কে সর্তক করে এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কে শত্রুর আগ্রাসন সম্পর্কে অবগত করার জন্য দূত প্রেরণ করে। হযরত আবু বকর (রা.) সবাইকে নিজ নিজ জায়গায় দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন, ফলে সকল সেনাদল তেমনই করে। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) মসজিদে উপস্থিত মুসলমানেদেরকে নিয়ে উটে আরোহণ করে তাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, ফলে শত্রুরা পিছু হটে যায়। মুসলমানেরা নিজেদের উটে আরোহণ করে তাদের পিছু ধাওয়া করে যু-হিস্‌সা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আক্রমণকারীদের সাহায্যকারী দল চামড়ার থলেতে বাতাস ভরে সেগুলোতে রশি দিয়ে বেঁধে

মুসলমাদের মোকাবিলার জন্য অগ্রসর হয়। তারা তাদের পা দিয়ে আঘাত করে এই পানি বহনের থলেগুলোকে উটের সামনে ঝুলিয়ে দেয়। উট যেহেতু ঝুলন্ত দদুল্যমান কোন জিনিসকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায় তাই (চামড়ার) পানির থলেগুলোকে দুলতে দুলতে আসতে দেখে মুসলমানদের উটগুলো এমনভাবে ভয় পেয়ে দৌড়াতে থাকে যে, উটের ওপর আরোহিত মুসলমানরা কোনভাবেই (উটগুলোকে) নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি আর এভাবে অবশেষে তারা মদিনায় পৌঁছে যায়। অবশ্য এতে মুসলমানদের কোনো ক্ষতি হয় নি আবার কোনকিছু তাদের হস্তগতও হয় নি। মুসলমানদের বাহ্যত এই সাময়িক পিছপা হওয়ার ফলে শত্রুরা এই ধারণা করে যে, মুসলমানরা দুর্বল, তাদের মাঝে মোকাবিলা করার কোনো শক্তি নেই। তাদের এই অলীক ধারণার মাঝে তারা যুল কাস্‌সায় অবস্থানরত সঙ্গীদের এই ঘটনা অবগত করে, তারা এই সংবাদের ভিত্তিতে এই দলের কাছে পৌঁছায়। কিন্তু তারা জানতো না যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের বিষয়ে ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন যা তিনি যেকোন মূল্যে বাস্তবায়ন করে ছাড়বেন। হযরত আবু বকর (রা.) রাতভর নিজের সেনাবাহিনীর প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন আর সবাইকে প্রস্তুত করে রাতের শেষভাগে পুরো সৈন্যবাহিনীকে বিন্যস্ত করে পায়ে হেঁটেই যাত্রা করেন। নোমান বিন মুকার্‌রিন (রা.) (সেনাদলের) ডান বাহুতে, আব্দুল্লাহ্ বিন মুকার্‌রিন (রা.) (সেনাদলের) বাম বাহুতে এবং সওয়ায়েদ বিন মুকার্‌রিন (রা.) সেনাদলের পেছনের অংশের দায়িত্বে ছিলেন, তাদের সাথে কতিপয় বাহনে আরোহী সেনাও ছিল। সূর্যোদয়ের পূর্বেই মুসলমানরা এবং যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীরা একই মাঠে মুখোমুখি ছিল। মুসলমানদের আগমনের আভাস ও সাড়াশব্দও তারা পায় নি, মুসলমানরা তাদের ওপর তরবারি নিয়ে অতর্কিতে হামলা করে বসে। রাতের শেষ প্রহরে যুদ্ধ হয়। সূর্যের কিরণ তখনও দিগন্তকে আপন আলোয় আলোকিত করে নি এমন সময় অস্বীকারকারীরা পরাজিত হয়ে পলায়নের পথ বেছে নেয়।

আরো লিখা আছে, মুসলমানরা তাদের সব পশু-পাখি করায়ত্ব করে নেয়। এ ঘটনায় হিবাল মারা যায়। হযরত আবু বকর (রা.) তাদের পশ্চাদ্ধাবণ করতে করতে যুল কাস্‌সায় গিয়ে উপস্থিত হন। এটি প্রথম বিজয় ছিল যা আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের প্রদান করেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) নোমান বিন মুকার্‌রিনকে কিছু লোকসহ সেখানেই মোতায়েন করেন আর তিনি নিজে মদিনায় ফিরে আসেন। এটি 'তাবারী'র ইতিহাস থেকে নেয়া। এই যুদ্ধকে বদরের যুদ্ধের সাথে সাদৃশ্য দিতে গিয়ে একজন লেখক লিখেন, উক্ত ঘটনায় হযরত আবু বকর (রা.) যে ঈমান, বিশ্বাস, সংকল্প ও অবিচলতা এবং সাবধানতা ও সতর্কতা প্রদর্শন করেছেন তাতে মুসলমানদের হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর যুগের বিভিন্ন যুদ্ধের স্মৃতি জাগ্রত হয়। আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকালের এই প্রথম যুদ্ধ বদরের যুদ্ধের সাথে অনেকাংশেই সাদৃশ্যপূর্ণ। বদরের যুদ্ধে স্বল্পসংখ্যক, অর্থাৎ শুধু ৩১৩ জন মুসলমান ছিল, যার বিপরীতে মক্কার মুশরিকদের সংখ্যা এক হাজারের অধিক ছিল। উক্ত সময়ে, অর্থাৎ হযরত আবু বকরের সাথে বিরুদ্ধবাদীদের যুদ্ধের যে ঘটনা ঘটেছে তখনও মুসলমানদের সংখ্যা খুবই অল্প ছিল। এর বিপরীতে আব্‌স, যুবইয়ান এবং গাতফান গোত্রসমূহ বিশাল জনবল নিয়ে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করেছিল। বদরের যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'লা মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় দান করেন আর এখানেও আবু বকর (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীসাথীরা দৃঢ় ঈমানের স্বাক্ষর রেখেছেন আর শত্রুদের ওপর বিজয় লাভ করেছেন। যেভাবে বদরের যুদ্ধ সুদূরপ্রসারী ফলাফল বয়ে এনেছিল তদ্রূপ এ যুদ্ধেও মুসলমানদের বিজয় ইসলামের ভবিষ্যতের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। বনু যুবইয়ান এবং বনু আবস গোত্র এ পরাজয়ের কারণে ক্রোধ ও ক্ষোভে নিজ এলাকার মুসলমানদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করে তাদেরকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট দিয়ে শহীদ করে দেয়। তারা এই প্রতিশোধ নেয়, অর্থাৎ তাদের এলাকায় যেসব নিরস্ত্র মুসলমান বাস করত তাদেরকে হত্যা করে শহীদ করে দেয় আর তাদের অনুকরণে অন্যান্য গোত্রও একই কাজ করে। এসব অত্যাচারের সংবাদ পেয়ে হযরত আবু বকর (রা.) কসম খেয়ে প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি মুশরিকদের যথোচিতভাবে হত্যা করবেন আর যেসব গোত্রে যারাই মুসলমানদের হত্যা করেছে তাদেরকে প্রতিশোধস্বরূপ হত্যা করবেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর নেতৃত্ব এবং দিক-নির্দেশনায় যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের ওপর আক্রমণের পর বিভিন্ন দুর্বল এবং দ্বিধান্বিত গোত্রসমূহ একের পর এক নিজেদের যাকাত নিয়ে মদিনায় আসতে থাকে। দুর্বল গোত্রসমূহ যারা যাকাতের সম্পদ ধরে রেখেছিল তারা যখন শক্তিশালী গোত্রগুলোর এই অবস্থা দেখে তখন তারা যাকাত নিয়ে মদিনায় আসতে আরম্ভ করে। কোন গোত্র রাতের প্রথমাংশে যাকাত নিয়ে আসে, কেউ রাতের মধ্যাংশে আবার কেউবা রাতের শেষাংশে আসে। যখন এরা মদিনায় আসত তখন প্রত্যেক দলের আগমনের সময় লোকজন বলত, এরা ভয়ের কারণ বলে মনে হচ্ছে, অর্থাৎ কোন দুঃসংবাদ আনয়নকারী। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) সকল ক্ষেত্রে এটিই বলেন যে, এরা সুসংবাদ বহনকারী, সমর্থনের জন্য এসেছে ক্ষতিসাধনের জন্য নয়। যাহোক, এটি যখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই দলগুলো ইসলামের সাহায্যার্থে এসেছে আর যাকাতের সম্পদ সাথে নিয়ে এসেছে তখন মুসলমানরা হযরত আবু বকর

(রা.)-কে বলল, আপনি খুবই কল্যাণমণ্ডিত একজন মানুষ, আপনি সর্বদা সুসংবাদই দিয়ে আসছেন। এতে হযরত আবু বকর (রা.) এটিও বলেন যে, দুঃসংবাদ এবং মন্দ উদ্দেশ্যে আগমনকারীরা তড়িঘড়ি যাত্রা করে পক্ষান্তরে সুসংবাদ আনয়নকারী দল শান্ত ও ধীরে-সুস্থে যাত্রা করে। আমি তাদের গতিবিধির মাধ্যমে ধারণা করে নেই। যাকাত প্রদানে অস্বিকারকারীদের বিরূদ্ধে সফলতা লাভের পর যাকাত আদায় সম্পর্কে তাবারির ইতিহাসে উল্লেখ আছে, সেই যুগে মদিনায় এত বেশি যাকাত সমবেত হয় যা মুসলমানদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছিল। এসব বিজয় এবং সুসংবাদের মাঝেই হযরত উসামার বাহিনীও সাফল্য ও বিজয়মাল্য পরিহিত হয়ে মদিনায় ফিরে আসে। হযরত উসামার ফিরে আসার পর হযরত আবু বকর (রা.) তাকে মদিনায় নিজের নায়েব নিযুক্ত করেন। এটিও বলা হয়ে থাকে যে, হযরত আবু বকর সিনান যামরীকে নিজের নায়েব নিযুক্ত করেছিলেন আর তাকে (অর্থাৎ উসামাকে) এবং তার বাহিনীকে বলেন, এখন তোমরাও বিশ্রাম নাও আর বাহনরূপে ব্যবহৃত পশুগুলোকেও বিশ্রাম নিতে দাও। আর হযরত আবু বকর (রা.) স্বয়ং লোকজনের সাথে বাহনে বসে যুল কাস্‌সা যাত্রা করেন। কিন্তু মুসলমানরা হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে নিবেদন করে যে, হে রসূল (সা.)-এর খলীফা! আপনার কাছে খোদার দোহাই দিয়ে অনুরোধ করছি, আপনি স্বয়ং এই অভিযানে যাবেন না। কেননা আল্লাহ্ না করুন, যদি আপনার কোন ক্ষতি হয়ে যায় তাহলে পুরো ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে পড়বে। আপনি এই কাজের জন্য অন্য কাউকে প্রেরণ করুন, যেন তার কোন কিছু হলে আপনি অন্য কাউকে তার স্থলে নিযুক্ত করতে পারেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি কিছুতেই এমনটি করব না। আমি নিজের প্রাণ দিয়ে আপনাদের দুঃখ লাঘব করব।

অতঃপর রাবাযাবাসীদের ওপর আক্রমণ সম্পর্কে লিখিত আছে, হযরত আবু বকর (রা.) সবকিছুর ব্যবস্থা করে যু-হিস্‌সা এবং যুল কাস্‌সা চলে যান। যুল কাস্‌সা মদিনা থেকে ৪০ মাইল দূরবর্তী একটি স্থান। নোমান, আব্দুল্লাহ্ আর সুআয়েদ নিজ নিজ স্থানে ছিলেন। এক পর্যায়ে হযরত আবু বকর আবরাক নামক স্থানে রাবাযাবাসীদের বসতিস্থলে পৌঁছে যান আর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা হারেস এবং অউফকে পরাজিত করেন, যারা মুররা, সালেবা এবং আবাস গোত্রের নেতা ছিল। ফুতায়হাকে জীবিত আটক করা হয়। হযরত আবু বকর কয়েক দিন আবরাক-এ অবস্থান করেন এবং আবরাক অঞ্চলকে মুসলমানদের ঘোড়া সমূহের চারণভূমি বানিয়ে দেন। এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বনু আবস এবং বনু যুবইয়ান (গোত্র) তুলায়হার দলে যোগ দেয়, যে সুমায়রা থেকে রওয়ানা হয়ে বুযাখায় অবস্থান গ্রহণ করে। বুযাখা হল বনু আসাদ গোত্রের ঝরনার নাম, যেখানে তুলায়হা আসাদী-র সাথে হযরত আবু বকরের যুগে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল।

অতঃপর একজন লেখক পরাজিত গোত্রগুলোর আচরণ সম্পর্কে লিখেন, আবাস, যুবইয়ান, গাতফান, বনু বকর এবং মদিনার নিকটে বসবাসকারী অন্যান্য বিদ্রোহী গোত্রগুলোর জন্য সমীচীন ছিল হঠকারিতা এবং বিদ্রোহ থেকে বিরত হয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর পূর্ণ আনুগত্য ও ইসলামী নির্দেশাবলী পালনের অঙ্গীকার করা আর মুসলমানদের সাথে একত্রিত হয়ে মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। বুদ্ধিমত্তার দাবিও এটিই ছিল আর বাস্তব পরিস্থিতিও এটিকেই সমর্থন করতো। হযরত আবু বকরের মাধ্যমে তাদের শক্তি খর্ব হয়ে পড়েছিল। রোমান সীমান্তে সফলতা লাভের কারণে মদিনাবাসীদের প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের শক্তি ও সামর্থ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। আর এখন তারা সেই দুর্বল অবস্থায় ছিল না যা বদরের যুদ্ধ এবং প্রাথমিক রণসমূহে তাদের ছিল। তখন মক্কা-ও তাদের সাথে ছিল আর তায়েফও। এই উভয় শহরের নেতৃত্ব পুরো আরবে স্বীকৃত ছিল। এছাড়া স্বয়ং সেই গোত্রগুলোতে বহু এমন মুসলমান ছিল যাদেরকে বিদ্রোহীরা কোনভাবেই নিজেদের দলভুক্ত করতে পারে নি। এভাবে তাদের অবস্থান খুবই দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছিল আর লাভলোকসানের চেতনা তাদের মাঝ থেকে হারিয়ে যেতে থাকে। তারা নিজেদের মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে আর বনু আসাদ গোত্রের নবুয়্যতের মিথ্যা দাবিকারক তুলায়হা বিন খুয়ায়লেদ-এর সাথে যোগ দেয়। তাদের মাঝে যেসব মুসলমান ছিল তারা তাদেরকে তাদের অভিসন্ধি থেকে বিরত রাখতে পারে নি। তাদের সেখানে পৌঁছানোর ফলে তুলায়হা এবং মুসায়লামার শক্তি বৃদ্ধি ঘটে আর ইয়েমেনে বিদ্রোহের অনল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে।

যাহোক এটি সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, তারা বিদ্রোহ করেছিল এবং যুদ্ধ করেছিল। শুধু কোন দাবি বা কারও দাবির কারণে এই যুদ্ধ হয় নি। বিদ্রোহের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হচ্ছিল। আর যে যুদ্ধ আরম্ভ করা হয়েছিল তার উত্তর দেয়া হচ্ছিল যুদ্ধের মাধ্যমে। যাকাতের অস্বীকারকারীদের ওপর বিজয় লাভ এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর বীরত্ব ও দৃঢ়সংকল্পের উল্লেখ করতে গিয়ে আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ তার একটি রেওয়ায়েতে বলেন,

মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর আমরা এমন এক অবস্থানে ছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লা যদি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মাধ্যমে আমাদের সাহায্য না করতেন তাহলে ধ্বংস অনিবার্য ছিল। আমাদের সমস্ত মুসলমানের সর্বসম্মত ধারণা এটিই ছিল যে, আমরা

যাকাতের উটের জন্য অন্যদের সাথে যুদ্ধ করব না। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতে মগ্ন হয়ে যাব যতক্ষণ না আমাদের পূর্ণ বিজয় লাভ হয়। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যাকাতের অস্বীকারকারীদের সাথে লড়াইয়ের জন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হন। তিনি অস্বীকারকারীদের সামনে কেবল দুটি বিষয় উপস্থাপন করেন, তৃতীয় কোন বিষয় নয়। প্রথমত নিজেদের জন্য তাদেরকে অপমান ও লাঞ্ছনা বরণ করে নিতে হবে, আর যদি তা মেনে না নেয় তাহলে যেন তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। নিজেদের জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা বরণ করার অর্থ ছিল তাদের এ কথা স্বীকার করা যে, তাদের নিহতরা জাহান্নামী এবং আমাদের নিহতরা জান্নাতী। তারা আমাদেরকে আমাদের নিহতদের রক্তপণ দিবে। আমরা তাদের কাছ থেকে গনিমতের সম্পদ হিসেবে যা নিয়েছি তা ফিরিয়ে দেয়ার দাবি উত্থাপন করবে না। কিন্তু যে সম্পদ তারা আমাদের কাছ থেকে নিয়েছে তা আমাদেরকে ফেরত দিতে হবে। আর দেশান্তরের শাস্তি গ্রহণ করার অর্থ হল, পরাজিত হওয়ার পর নিজেদের এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে এবং দূর দূরান্তের অঞ্চলে গিয়ে জীবন অতিবাহিত করবে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন,

মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর কতিপয় আরব গোত্র যখন যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যান। তখন পরিস্থিতি এত স্পর্শকাতর ছিল যে, হযরত উমরের ন্যায় ব্যক্তি তাদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শনের পরামর্শ দেন। এর উল্লেখ পূর্বেও করা হয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) উত্তর দেন, আবু কোহাফার পুত্রের কী সাধ্য যে, সে সেই আদেশকে রহিত করবে যা মহানবী (সা.) প্রদান করেছেন। খোদার কসম, তারা যদি মহানবী (সা.)-এর যুগে উটের হাঁটু বাঁধার একটি রশিও যাকাত হিসেবে দিয়ে থাকতো তাহলে সেই রশিও আমি তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করে ছাড়ব। আর ততক্ষণ ক্ষান্ত হব না যতক্ষণ তারা যাকাত প্রদান না করবে। তিনি তার সঙ্গীদের বলেন তোমরা যদি এই বিষয়ে আমার সঙ্গ দিতে না পার, তাহলে দিও না। আমি একাই তাদের মোকাবিলা করব। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এটি মহানবী (সা.)-এর কত উচ্চ মানের আনুগত্য যে, একান্ত বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে বড় বড় সাহাবীদের লড়াইয়ের বিরুদ্ধে পরামর্শ দেয়া সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ পূর্ণ করার জন্য তিনি সকল প্রকার ঝুঁকি মাথাপেতে নেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান!

অতঃপর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) অপর এক স্থলে বর্ণনা করেন,

হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে যখন ধর্মত্যাগের ফিতনা ছড়িয়ে পড়ে আর কেবল গ্রামগুলোতে বাজামা'ত নামায পড়ার রীতি বাকি রয়ে যায়, অধিকন্তু সেনাবাহিনীও সিরিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়, তাসত্ত্বেও তিনি যাকাত প্রদানকারীদের নামে নির্দেশ প্রেরণ করেন, মহানবী (সা.)-এর যুগে কেউ যদি রশিও দিতো আর এখন না দেয়, তাহলে আমি তরবারির জোরে তা আদায় করব। হযরত উমরের ন্যায় বীর ও সাহসী ব্যক্তিও এই মত প্রদান করেন যে, এখন সময়ের দাবি এটি নয় যে, যাকাতের ওপর বলপ্রয়োগ দেয়া হবে, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) তার কোন কথা শুনেন নি। এ থেকে বোঝা যায় যে, যাকাত কতটা আবশ্যক। এই কথাটি, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাঁর এক বক্তৃতার বর্ণনা করেছিলেন যাতে তিনি তাকওয়ার বিভিন্ন স্তরের বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন। তাতে তিনি তাকওয়ার ধাপগুলো কি কি আর যাকাতের কতটা গুরুত্ব রয়েছে এবং তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য তা একান্ত আবশ্যক– এসব বিষয়ের উল্লেখ করেন। সেখানে তিনি একথাও বলেছিলেন যে, আহমদীদেরও এই বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত যে, যাকাত কতটা আবশ্যক এবং তা নিয়মিত আদায়ের ব্যবস্থা করা উচিত।

অপর এক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ বলেন,

একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যাকাত; [যাকাতের বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি একথা বলেন;] কিন্তু মানুষজন এটি বোঝে নি। খোদা তা'লা নামাযের পরই এর নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আবু বকর বলেন, যারা যাকাত দেবে না, তাদের সাথে আমি সেই আচরণই করব যা মহানবী (সা.) কাফেরদের সাথে করতেন। এমন লোকদের পুরুষ সদস্যদেরকে আমি দাস বানাব ও তাদের নারীদেরকে বানাব দাসী। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর এমন বিপদ উপস্থিত হয় যে, আরবের তিনটি শহর- মক্কা, মদিনা ও আরেকটি শহর ছাড়া সব অঞ্চল মুরতাদ (তথা ধর্মত্যাগী) হয়ে যায়। হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন যে, ঠিক আছে, যাকাতের অস্বীকারকারীদের সাথে সন্ধি করে নিন! প্রথমে অন্য মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ হয়ে যাক, ধীরে ধীরে এদেরও সংশোধন হয়ে যাবে। প্রথম প্রয়োজন নবুয়তের মিথ্যা দাবিকারকদের সমূলে বিনাশ করা উচিত, কারণ তাদের সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা অধিক তীব্র। হযরত আবু বকর বলেন, লোকজন যদি ছাগলছানা বা উটের হাঁটু বাঁধার রশির সমান পরিমাণ যাকাতের প্রাপ্য জিনিসও প্রদান না করে যা মহানবী (সা.)-এর কাছে প্রদান করতো, তবে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব। আর যদি তোমরা আমাকে ছেড়ে চলে যাও এবং বনের হিংস্র পশুরাও মুরতাদদের সাথে একযোগে আক্রমণ করে, তবে আমি একাই তাদের সাথে লড়ব। খেলাফতের কল্যাণরাজির মধ্যে এটিও অন্যতম যে, শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য যুগ-খলীফা পূর্ণ প্রচেষ্টা করে থাকেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) অন্যত্র বর্ণনা করেন, মানুষজন আরেকটি আপত্তি করে থাকে, কিন্তু খোদা তা'লা সেটির উত্তরও তেরশ' বছর পূর্বেই দিয়ে দিয়েছেন। মানুষ [অর্থাৎ আপত্তিকারীরা] বলে, شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ *(সূরা আলে ইমরান: ১৬০)* [অর্থাৎ, তাদের সাথে পরামর্শ কর;] নির্দেশটি তো মহানবী (সা.)-কে দেয়া হয়েছে; এর মাঝে খেলাফত এল কোত্থেকে? খেলাফতের জন্য তো এই নির্দেশ প্রযোজ্য নয়! কিন্তু তারা যেন স্মরণ রাখে যে, যাকাত প্রসঙ্গে যখন হযরত আবু বকরের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হয় সেটিও এ ধরনেরই ছিল যে خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً *(সূরা তওবা: ১০৩)* [অর্থাৎ, তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ কর]– এই নির্দেশ তো মহানবী (সা.)-কে দেয়া হয়েছে; এখন তিনি নেই, তাই অন্য কারও অধিকার নেই যে, সে যাকাত আদায় করবে। যাকে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। হযরত আবু বকর এই উত্তরই প্রদান করেন যে, এখন আমি হলাম সম্বোধিত ব্যক্তি। অর্থাৎ হযরত আবু বকর এখন সম্বোধিত ব্যক্তি। মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু শরীয়ত তো সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে; তাই এখন সম্বোধিত ব্যক্তি হলেন যুগ-খলীফা। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ যখন এই বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন তিনি বলেন, এই সুরে সুর মিলিয়ে আমি আমার ওপর আপত্তিকারীদের বলছি যে, এখন আমি হলাম সম্বোধিত ব্যক্তি। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, যদি সেই সময় এই উত্তর সঠিক হয়ে থাকে, এবং অবশ্যই সেটি সঠিক ছিল যা হযরত আবু বকর উত্তরে বলেছিলেন, তাহলে আমি যা বলছি তা-ও সঠিক যে, আজ আমি হলাম সম্বোধিত ব্যক্তি। আর এই নীতিই সর্বদা খেলাফতের ক্ষেত্রে প্রজোয্য হবে। এই কথাটি স্মরণ রাখার মতো! এরপর তিনি বলেন, তোমাদের আপত্তি যদি সঠিক হয়, তবে তো কুরআন শরীফ থেকে অনেক নির্দেশ বাদ দিয়ে দিতে হবে, আর তা হবে সুস্পষ্ট ভ্রান্তি। এই কথাগুলো তিনি (রা.) ঐ সময় বলছিলেন, যখন তিনি মনসবে খেলাফত (বা খেলাফতের মর্যাদার) বিষয়ে একটি বক্তৃতা করছিলেন।

এরপর অপর এক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ বর্ণনা করেন,

মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করলে অনেক অভাগা মুসলমান মুর্তাদ হয়ে যায়। ইতিহাসে লেখা আছে, কেবল এমন তিনটি স্থান অবশিষ্ট ছিল যেখানে মসজিদে বাজামা'ত নামায পড়া হতো। একইভাবে রাষ্ট্রের অধিকাংশ লোক যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় আর তারা বলা শুরু করে যে, মহানবী (সা.)-এর (মৃত্যুর) পর আমাদের কাছে যাকাত চাওয়ার কী অধিকার আছে? যখন এই ধ্যানধারণা পুরো আরবে ছড়িয়ে পড়ে আর হযরত আবু বকর (রা.) এমন লোকদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়ার মনস্থ করেন তখন হযরত উমর (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীরাও হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে এসে উপস্থিত হন আর পূর্বেও যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা এসে নিবেদন করেন, এখন পরিস্থিতি বেশ স্পর্শকাতর, এ মুহূর্তে সামান্য অবহেলা বিরাট ক্ষতির কারণ হতে পারে তাই আমাদের পরামর্শ হল, এত বড় শত্রুর মোকাবিলা করার পরিবর্তে যারা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে তাদের সাথে বিনম্র আচরণ করা হোক। হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরে বলেন, তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি ভয় পায়, সে যেখানে খুশি চলে যেতে পারে। আল্লাহ্‌র শপথ! তোমাদের একজনও যদি আমাকে সঙ্গ না দেয় তবুও আমি একাই শত্রুর মোকাবিলা করব আর শত্রু যদি মদিনায় প্রবেশ করে এবং আমার প্রিয়জন আর নিকটাত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদেরকে হত্যা করে আর কুকুর যদি মহিলাদের লাশ নিয়ে মদিনার অলি-গলিতে টানাহ্যাঁচড়াও করে তবুও আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব এবং ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হব না যতক্ষণ এরা উটের পা বাঁধার সেই রশিও যাকাত হিসেবে প্রদান না করে যা তারা পূর্বে প্রদান করত। মোটকথা হযরত আবু বকর (রা.) শত্রুর দুষ্কর্মের বীরবিক্রমে মোকাবিলা করেছেন এবং অবশেষে সফলও হয়েছেন, তা কেবল এ কারণে যে, তিনি (রা.) জানতেন, এ কাজ আমাকেই করতে হবে। তাই তিনি পরামর্শদানকারী সাহাবীদের বলেছিলেন, তোমাদের মাঝ থেকে কেউ আমাকে সঙ্গ দিক বা না দিক, যতক্ষণ আমি জীবিত আছি আমি একা-ই শত্রুর মোকাবিলা করব। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, অতএব যে জাতির মাঝে এমন দৃঢ়প্রত্যয় সৃষ্টি হয়ে যায়, তারা প্রত্যেক ময়দানে বিজয়ী হয় আর শত্রু তাদের সামনে দাঁড়াতে পারে না এবং জাতীর উন্নতির এটিই রহস্য– যা সদা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

অন্য এক স্থলে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর যাকাতের বিষয়ে মতভেদের কারণে যখন আরবের হাজার হাজার লোক মুর্তাদ হয়ে যায় এবং মুসায়লামা মদিনার ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয় তখন তৎকালীন খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) এ বিষয়ে সংবাদ পান যে, মুসায়লামা এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করতে আসছে। এমতাবস্থায় কিছু লোক হযরত আবু বকর (রা.)-কে এই পরামর্শ দেয় যে, এ মুহূর্তে আমরা যেহেতু এক স্পর্শকাতর সময় অতিক্রম করছি আর যাকাত সম্পর্কে মতবিরোধের কারণে লোকজন মুর্তাদ হয়ে যাচ্ছে, আবার অপরদিকে মুসায়লামা বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করতে উদ্যত, তাই এমন অবস্থার নিরিখে যা সমীচীন বলে অনুমেয় তা হল, আপনি আপাতত যাকাতের দাবি ছেড়ে দিন এবং তাদের সাথে সন্ধিচুক্তি করে নিন। হযরত আবু বকর (রা.) সেসব শঙ্কার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করেন নি। ভ্রুক্ষেপহীনতার প্রকাশ করতে গিয়ে পরামর্শদাতাদের তিনি বলেন, তোমরা কি আমাকে সে কথা মানাতে

চাও- যা খোদা তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর আদেশের সম্পূর্ণ বিপরীত? যাকাতের আদেশ খোদা তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। তাই খোদা এবং তাঁর রসূল (সা.)–এর আদেশের বাস্তবায়নের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা আমার জন্য আবশ্যক। সাহাবীরা পুনরায় বলেন, পরিস্থির নিরিখে সন্ধি করা এখন সময়ের দাবি। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আপনারা যদি যুদ্ধ করতে আগ্রহী না হন এবং শত্রুর মোকাবিলায় যুদ্ধ করার শক্তি-সামর্থ্য না রাখেন তাহলে আপনারা গিয়ে নিজ নিজ গৃহে বসে থাকুন। আল্লাহ্‌র শপথ, আমি শত্রুর সাথে একাই ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাব যতক্ষণ যাকাত হিসেবে প্রদেয় উটের পা বাঁধার রশি প্রদান না করবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের যাকাত প্রদানের স্বীকারোক্তি আদায় না করছি ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে কখনও মিমাংসা করব না। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, প্রকৃত ঈমানের বৈশিষ্ট্য এটিই। অতএব এটিই ঈমান আর এটি যদি আমাদের মাঝে থাকে তবে আমরা পৃথিবীব্যাপী ইসলামের প্রকৃত বার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হব এবং ইনশাল্লাহ্ সফল হব।

অতঃপর এক স্থলে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন,

মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর আরবের গোত্রগুলো বিদ্রোহ করে বসে এবং তারা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারাও এই যুক্তি প্রদর্শন করতো যে, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.) ছাড়া অন্য কাউকে যাকাত আদায়ের অধিকার দেন নি। আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! তুমি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত হিসেবে কিছু অংশ গ্রহণ করো। এমন কথা কোথাও উল্লেখ নেই যে, মহানবী (সা.)-এর পর অন্য কারও যাকাত গ্রহণের অধিকার রয়েছে, কিন্তু মুসলমানরা তাদের এই যুক্তি গ্রহণ করে নি যখন কিনা সেখানে বিশেষভাবে মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। মোটকথা, তখন যারা মুর্তাদ হয়েছে তাদের শক্তিশালী যুক্তি এটিই ছিল যে, যাকাত গ্রহণের অধিকার কেবল মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ছিল; অন্য কারও নয়। আর এর নেপথ্যে এই ভুল ধারণাটিই ছিল যে, নেযাম (বা ব্যবস্থাপনা) সংক্রান্ত বিধিবিধান সবসময় অনুসরণযোগ্য নয়, বরং তা একান্তই মহানবী (সা.)-এর জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু তিনি (রা.) বলেন, এটি সম্পূর্ণ একটি ভ্রান্ত ধারণা। প্রকৃত বিষয় হল, যেভাবে নামায-রোযার বিধি-বিধান মহানবী (সা.)-এর যুগাবসানের মাধ্যমে রহিত হয়ে যায় নি, অনুরূপভাবে জাতিগত বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধি-বিধানও তাঁর (সা.) মৃত্যুর সাথে সাথে রহিত হয়ে যায় নি। বাজামা'ত নামাযের ন্যায় যা একটি সমষ্টিগত ইবাদত, এসব বিধি-বিধানের ক্ষেত্রেও আবশ্যক হল– মহানবী (সা.)-এর নায়েবদের মাধ্যমে সদা তা বাস্তবায়িত হওয়া।

অতঃপর আরেক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন,

মহানবী (সা.) যখন মৃত্যুবরণ করেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা নিযুক্ত হন তখন গোটা আরব মুর্তাদ হয়ে যায়। মক্কা-মদিনা আর ছোট্ট একটি উপশহর ছাড়া সবাই যাকাত দিতে অস্বীকার করে বসে এবং বলে, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে বলেছিলেন خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً অর্থাৎ তাদের ধনসম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ *করো (সূরা তওবা: ১০৩)*। অন্য কারও আমাদের নিকট থেকে যাকাত আদায়ের কোন অধিকার নেই। মোটকথা, গোটা আরব মুর্তাদ হয়ে যায় আর কেবল মুর্তাদ-ই হয় নি বরং যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। মহানবী (সা.)-এর যুগে ইসলাম (প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে) দুর্বল ছিল, কিন্তু আরবের গোত্রগুলো পৃথক পৃথকভাবে আক্রমণ করতো। কখনও একটি গোত্র আক্রমণ করলে কখনও অন্য গোত্র। আহযাবের যুদ্ধে কাফেরদের সৈনাবাহিনী যখন জোটবদ্ধভাবে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে সে সময় পর্যন্ত ইসলাম অনেকটা শক্তি সঞ্চয় করে ফেলেছিল; যদিও তখনও ততটা ক্ষমতাশীল হয়ে ওঠে নি যাতে ভবিষ্যতে নিজেদের ওপর আর কোন ধরনের আক্রমণের শঙ্কা নেই বলে মুসলমানরা ধারণা করতে পারে। অতঃপর মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তখন আরবের কয়েকটি গোত্রও তাঁর (সা.) সমর্থনে দণ্ডায়মান হয়। অনুরূপভাবে খোদা তা'লা শত্রুদের মধ্যে উদ্দীপনা ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি করেন যেন তারা গোটা দেশে বিস্তৃতি লাভ করার মতো প্রবল ক্ষমতাধর না হয়ে ওঠে, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে একযোগে গোটা আরব মুর্তাদ হয়ে যায়; কেবল মক্কা, মদিনা ও একটি ছোট উপশহর অবশিষ্ট ছিল আর বাদ বাকি সব স্থানে মানুষ যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং সৈনাবাহিনী নিয়ে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে বের হয়। কেবল যাকাত দিতেই অস্বীকৃতি জানায় নি, বরং তারা সৈন্য নিয়ে লড়াই করতে বেরিয়ে পড়ে। কোন কোন স্থানে তাদের নিকট লক্ষ লক্ষ সৈন্য ছিল। আর অপরদিকে এখানে কেবলমাত্র দশ হাজারের একটি সেনাদল ছিল আর তা-ও আবার সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। আর এটি সেই সেনাদল যা মহানবী (সা.) নিজ মৃত্যুর নিকটবর্তী সময় রোমীয় এলাকায় অভিযানের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন আর উসামাকে এই বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। অবশিষ্ট যারা ছিল তারা হয়ত বৃদ্ধ ও দুর্বলরা ছিল বা হাতে গোনা কয়েকজন যুবক ছিল। এই অবস্থা দেখে সাহাবীরা মনে করেন যে, এমন বিদ্রোহের সময় উসামার নেতৃত্বাধীন এই সেনাদলও যদি যাত্রা করে তাহলে মদিনার নিরাপত্তার কোন উপায় থাকবে না। অতএব (এমন পরিস্থিতি দেখে) জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের একটি দল হযরত আবু বকর (রা.)-র সমীপে

উপস্থিত হয়; যেমনটি পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। তারা নিবেদন করে, এই সেনাদলকে কিছুদিনের জন্য যাত্রা করা থেকে বিরত রাখা হোক। যখন বিদ্রোহ দমে যাবে তখন নিঃসন্দেহে এই সেনাদল পাঠানো যাবে, কিন্তু এই মুহূর্তে এটিকে প্রেরণ করা বিপজ্জনক। হযরত আবু বকর (রা.) অত্যন্ত রাগান্বিত স্বরে বলেন, তোমরা কি চাও মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর আবু কুহাফার পুত্র সর্বপ্রথম যে কাজটি করবে তা হল, মহানবী (সা.) যে সৈন্যবাহিনীকে প্রেরণ করার আদেশ দিয়েছিলেন– তা প্রেরণ নিষিদ্ধ করবেন? যাহোক তিনি (রা.) বলেন, এটি যাত্রা করবেই আর মহানবী (সা.) যে সেনাদলকে প্রেরণ করতে আদেশ দিয়েছিলেন, আমি সেটিকে অবশ্যই প্রেরণ করব। তোমরা যদি শত্রুসেনাকে ভয় পাও তাহলে নিঃসংকোচে আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করতে পার। আমি একাই সকল শত্রুর মোকাবিলা করব। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এটি يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا – এর সত্যতার অনেক বড় একটি প্রমাণ। অর্থাৎ, এই মু'মিনরা আমার ইবাদত করবে আর আমার সাথে কাউকে শরীক দাঁড় করাবে না, অর্থাৎ খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিতরা বা খেলাফতের অনুসারীরা। আর এটি হল সেই অবস্থা– যা খেলাফত ব্যবস্থার সাথে চলমান আছে এবং চলমান থাকবে।

এরপর তিনি (রা.) বলেন, দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল যাকাত বিষয়ক। সাহাবীগণ নিবেদন করেন, আপনি যদি এই সেনাবাহিনীর যাত্রা স্থগিত করতে না পারেন তাহলে অন্তত এটি করুন যে, এদের সাথে সাময়িক সন্ধি করে নিন আর তাদেরকে বলে দিন যে, আমরা এ বছর তোমাদের কাছ থেকে যাকাত নিব না। আর এই সময়ের মধ্যে তাদের উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যাবে আর অনৈক্য দূর হওয়ার একটি অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এমনটি কখনও হবে না। [তিনি এ কথাও মানেন নি।] এ কথা শুনে সাহাবীগণ বলেন, উসামার সৈন্যবাহিনীও যদি চলে যায় আবার এ সকল লোকদের সাথে সাময়িক সন্ধিও না করা হয় তাহলে শত্রুদের প্রতিরোধ কে করবে? মদিনায় তো শুধু এই কয়েকজন বৃদ্ধ ও দুর্বল ব্যক্তি আর কিছু যুবক রয়েছে, তারা এই লক্ষ সৈন্যের মোকাবিলা কীভাবে করবে? হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরে বলেন, হে বন্ধুরা! তোমরা যদি এদের মোকাবিলা করতে না পার তাহলে আবু বকর একাই তাদের মোকাবিলার জন্য দণ্ডায়মান হবে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এই ঘোষণা সেই ব্যক্তির যিনি রণকৌশল সম্বন্ধে খুব বেশি অবগত ছিলেন না আর যার সম্পর্কে সাধারণত এই ধারণাই করা হতো যে, তিনি দুর্বল হৃদয়ের অধিকারী। তাহলে এই সাহস, এই বীরত্ব, এই বিশ্বাস, এই দৃঢ়তা তাঁর মাঝে কীভাবে সৃষ্টি হল। এই কথা থেকেই হযরত আবু বকর (রা.)-এর মাঝে এই বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল যে, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন খোদা তা'লার পক্ষ থেকেই আমি খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছি আর আমার ওপরই সকল কাজের দায়িত্ব। অতএব আমার জন্য আবশ্যক হল, মোকাবিলা করার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া, সফলতা দেয়া বা না দেয়া আল্লাহ্ তা'লার হাতে। তিনি যদি সফলতা দিতে চান তাহলে তা দান করবেন আর যদি না দিতে চান তাহলে পুরো সৈন্যবাহিনী মিলেও (আমাকে) সফল করতে পারবে না।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর সিদ্ধান্তের কত অসাধারণ ফলাফল প্রকাশিত হয়েছিল– এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে,

হযরত আবু বকর (রা.) সাহাবীদের মতের বিপরীতে হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)-কে সৈন্যবাহিনীসহ মু'তার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। অতএব চল্লিশ দিন পর এ বাহিনী নিজ কার্য সমাধা করে বিজয়ীবেশে মদিনায় ফিরে আসে আর সবাই স্বচক্ষে খোদা তা'লার সাহায্য এবং বিজয় অবতীর্ণ হতে দেখে নেয়। এই অভিযানের পর হযরত আবু বকর (রা.) নবুয়্যতের মিথ্যা দাবিদারদের সৃষ্ট নৈরাজ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং এই নৈরাজ্য এমনভাবে দমন করেন যে, একে একদম পিষে ফেলেন, যার ফলে এই নৈরাজ্য পুরোপুরি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। পরবর্তীতে মুরতাদদেরও একই অবস্থা হয়। বড় বড় সাহাবীরাও হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথে মতোবিরোধ করেন এবং বলেন, যেসব লোক তৌহীদ ও রিসালাতের স্বীকৃতি প্রদান করে এবং শুধু যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় তাদের বিরুদ্ধে কীভাবে তরবারি উঠানো সম্ভব? কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) অত্যন্ত সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করে বলেন, আজ যদি যাকাত না দেয়ার অনুমতি দেয়া হয় তাহলে মানুষ ধীরে ধীরে নামায এবং রোযাও ছেড়ে দিবে আর ইসলাম কেবল নামসর্বস্ব রয়ে যাবে। মোটকথা এমন অবস্থায় হযরত আবু বকর (রা.) যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী লোকদের মোকাবিলা করেন আর এর ফলাফল যা দাঁড়িয়েছিল তা হল– এক্ষেত্রেও তিনি বিজয় ও ঐশী সাহায্য প্রাপ্ত হন এবং সমস্ত বিভ্রান্ত লোক সঠিক পথে ফিরে আসে।

এই ধারা এখনও চলমান রয়েছে, ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতেও এ বিষয়ে আলোচনা করব। যেভাবে আমি ইদানীং অনবরত আহবান জানিয়ে আসছি, বিশ্ব-পরিস্থিতির জন্য বেশি বেশি দোয়া অব্যাহত রাখুন এবং এ ক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রদর্শন করবেন না। বিশেষভাবে এ দোয়া করুন যে, জগদ্বাসী যেন তাদের সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারে, পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার এটিই একমাত্র মাধ্যম। আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন এবং আমাদের দোয়াসমূহ গ্রহণ করুন, আমীন।

এখন আমি একজন প্রয়াত ব্যক্তিরও স্মৃতিচারণ করব এবং জুমুআর নামাযের পর (গায়েবানা) জানাযা পড়াব। তিনি হলেন, শ্রদ্ধেয় মাওলানা মুবারক নযীর

সাহেব। তিনি জামেয়া আহমদীয়া কানাডার প্রিন্সিপাল ছিলেন এবং মুবাল্লেগ ইনচার্জও ছিলেন। গত ০৮ মার্চ তারিখে তিনি ৮৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। অত্যন্ত নিঃস্বার্থ, আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ ভরসাকারী, দোয়ায় অভ্যস্ত এবং অল্পেতুষ্ট মানুষ ছিলেন। নিতান্তই দরবেশ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাকে দেখলে সর্বদাই আমার মাঝে সত্যিকার বুযুর্গ দেখার অনুভূতি জাগ্রত হতো। তার পারিবারিক পরিচয় দিতে গেলে বলতে হয়– তিনি জামা'তের সফল মুবাল্লেগ মাওলানা নযীর আহমদ আলী সাহেব এবং শ্রদ্ধেয়া আমেনা বেগম সাহেবার দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। তার পরিবারে আহমদীয়াতের প্রবেশ ঘটে তার দাদা হযরত বাবু ফকীর আলী সাহেব (রা.)-এর মাধ্যমে। তিনি (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন এবং পরবর্তীতে কাদিয়ানের প্রথম স্টেশন মাস্টার নিযুক্ত হয়েছিলেন। কাদিয়ানে তার দাদার বাড়িও ছিল আর সেটি ফকীর মঞ্জিল নামে পরিচিত ছিল। মাওলানা মুবারক নযীর সাহেবের পিতা হযরত মাওলানা নযীর আহমদ আলী সাহেবের হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর নির্দেশ অনুসারে ১৯২৯ সনে প্রথমে ঘানাতে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য হয় এবং পরবর্তীতে তার নিযুক্তি হয় সিয়েরা লিওনে। ১৯৪৩ সনে তার পিতা হযরত মাওলানা নাযীর আহমদ আলী সাহেব সিয়েরা লিওন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন মুবারক নাযীর সাহেবও তার পিতামাতার সাথে সিয়েরা লিওনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এই সফরে একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনাও ঘটেছিল আর মাওলানা মুবারক নযীর সাহেব এর উল্লেখ করেছেন। সামুদ্রিক জাহাজে এটি তিন মাস দীর্ঘ একটি সফর ছিল। তখন তার, অর্থাৎ মুবারক নযীর সাহেবের বয়স ছিল ১১ বছর। সফরের মাঝে তিনি অসুস্থ হয়ে যান এবং রোগের প্রকোপ এমন ছিল যে, মনে হচ্ছিল এখন আর বাঁচবেন না। সামুদ্রিক জাহাজের সফর ছিল, যেমনটি আমি বলেছি। জাহাজে উঠছিলেন বা জাহাজ পরিবর্তন করছিলেন অথবা জাহাজে আরোহণ করছিলেন। এটি জাহাজে উঠার পূর্বের ঘটনা। যাহোক জাহাজে আরোহনের পূর্বে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন আর জাহাজের কর্তৃপক্ষ তার অবস্থা দেখে তার পিতাকে বলেন, আপনার পুত্র তো আধামরা, এর তো প্রাণ যায় যায় অবস্থা। সে যদি সফরে মারা যায় তাহলে আমাদের কাছে লাশ রাখার জন্য কোন হিমাগার নেই, কোন ব্যবস্থা নেই। তাই আপনার এই সন্তানের কারণে আমরা আপনাকে নিয়ে যেতে পারছি না। মাওলানা সাহেব পীড়াপীড়ি করে বলেন, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আর যে কোন মূল্যে আমি এই জাহাজে যাত্রা করব। অতঃপর জাহাজ কর্তৃপক্ষ তাকে একথা লিখে দেয়ার শর্তে জাহাজে বসার অনুমতি দেন যে, তার ছেলে যদি সফরকালীন সময় মারা যায় তবে তার লাশ সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার অনুমতি থাকবে। জাহাজের ক্যাপ্টেন যখন এই শর্তের কথা বলেন তখন মুবারক নযীর সাহেবের মাতা কাঁদতে আরম্ভ করেন, মর্মাহত হন এবং মাওলানা নযীর আলী সাহেবকে বলেন, ছেলের স্বাস্থ্যের এহেন অবস্থায় আমরা অন্য কোন জাহাজে সফর করব। মাওলানা নযীর আহমদ সাহেব তার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, আমি একজন মুবাল্লেগ যাকে হুযূর একটি দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমি জানি না, অন্য জাহাজ আবার কবে পাব? তার স্ত্রীকে তিনি বলেন, তুমি আশ্বস্ত থাক, মুবারকের কিছুই হবে না। একথা বলে তিনি জাহাজের ক্যাপ্টেনকে দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, কোথায় স্বাক্ষর করতে হবে? কাগজ নিয়ে আসুন। পুনরায় তিনি ক্যাপ্টেনকে বলেন, এই ছেলে যদি মারা যায় তবে তাকে সাগরে ফেলে দেবেন, কিন্তু একইসাথে আমি একথাও বলছি যে, তার কিছুই হবে না। এটি হল সেই খোদাভরসা যা তার পিতার খোদা তা'লার সত্তায় ছিল। অর্থাৎ আমি একজন ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী এবং তাঁর ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি, এখন আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই আমাকে সাহায্য করবেন এবং আমার পরিবার পরিজনের সুরক্ষা করবেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেই ১১ বছরের বালক কেবল জীবিতই ছিল না বরং তিনি ৮৭ বছরের জীবন পেয়েছেন এবং ইসলাম ও আহমদীয়াতের সেবার সৌভাগ্যও লাভ করেছেন। নিজ পিতৃপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণে জীবন উৎসর্গ করেছেন বা এ সৌভাগ্যও লাভ করেছেন এবং ধর্মসেবার ক্ষেত্রে নিজেও খোদাভরসার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

স্নাতক শেষ করার পর সরকারি প্রতিষ্ঠানে তিনি ভাল চাকরিও পেয়েছিলেন, যেখানে তিনি কিছুদিন কাজ করেন। অতঃপর সাময়িকভাবে হলেও ওয়াকফ করুন মর্মে আল ফযলে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর আহ্বান পড়ে তিনি চাকরি থেকে অব্যাহতি নিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর সমীপে সাময়িক ওয়াকফের আবেদন করেন। পরে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর নির্দেশ অনুসারে ১৯৬৩ সালে তিনি সর্বপ্রথম ওয়াক্‌ফে আরযীর জন্য সিয়েরা লিওন চলে যান, যেখানে একটি দীর্ঘ সময় তার পিতা হযরত মাওলানা নযীর আলী সাহেবও দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছিলেন। তার কবরও সেখানে ছিল, অর্থাৎ মৌলবী নযীর আলী সাহেব সেখানেই সমাহিত হয়েছিলেন। সিয়েরা লিওন পৌঁছেই সর্বপ্রথম তিনি তার পিতার কবরে (যিয়ারতের জন্য) উপস্থিত হন। তখন তিনি তার পিতার সেই কথাগুলো স্মরণ করেন যা জনাব মাওলানা নযীর আলী সাহেব ২৬ নভেম্বর ১৯৪৫ সালে তার একটি প্রাণোদ্দীপক বক্তৃতায় বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আজ আমরা খোদা তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে জিহাদ করতে এবং ইসলামকে পশ্চিম আফ্রিকায় বিস্তৃত করার লক্ষ্যে যাচ্ছি। মৃত্যু মানুষের সাথে লেগেই থাকে। আমাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে আপনারা মনে

রাখবেন, পৃথিবীর দূরদূরান্তের কোন একটি অঞ্চলে আহমদীয়াতের মালিকানায় সামান্য এক টুকরো জমি রয়েছে। আহমদী যুবকদের জন্য আবশ্যিক দায়িত্ব হলে, সেখানে পৌঁছা এবং সেই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করা যে লক্ষ্যে আমরা সেই ভূখণ্ডকে কবররূপে দখল করেছি। একথার অর্থ হল, আহমদীয়াতের সামান্য একটু জমি রয়েছে যেখানে একজন আহমদী মুবাল্লেগের কবর বিদ্যমান আর এই কবরের কারণে সেই জমির ওপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। সুতরাং আমাদের কবরগুলোর পক্ষ থেকে এই দাবি থাকবে যে, নিজ সন্তানসন্ততিকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিন যেন তারা তা পূর্ণ করে, যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়েছে। অতএব তার শ্রদ্ধেয় পিতার ওসীয়্যত অনুসারে মাওলানা মুবারক নযীর সাহেব সেখানে যান এবং পিতার কবরের সামনে উপস্থিত হয়ে বলেন, লাব্বায়েক! আমি উপস্থিত আর আপনার আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য আমি এসেছি। সিয়েরা লিওনের বিভিন্ন স্থানে তিনি দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর নির্দেশে ১৯৮৫ সালে তিনি পাকিস্তান ফেরত আসেন। ১৯৮৫ সালে আফ্রিকা থেকে ফেরত আসার পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর সমীপে তিনি অস্থায়ী জীবন উৎসর্গের পরিবর্তে স্থায়ীভাবে জীবন উৎসর্গের আবেদন করেন, যা হুযূর গ্রহণ করেন। এরপর পুনরায় ১৯৮৮ সালে তাকে মুবাল্লেগ হিসেবে কানাডা প্রেরণ করা হয়; যেখানে তিনি বিভিন্ন স্থানে মুবাল্লেগ হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ২০০৩ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর সদয় অনুমোদনক্রমে জামেয়া আহমদীয়া কানাডা চালু করার সিদ্ধান্ত হয় এবং প্রিন্সিপাল হিসেবে তাকে নিযুক্তও করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় জামেয়া চালু হয় নি। পরবর্তীতে আমার যুগে জামেয়া আরম্ভ হয় আর আমিও হযরত খলীফা রাবে (রাহে.) যাকে মনোনীত করেছিলেন তাকে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত দেই যে, তিনিই প্রিন্সিপাল হবেন। যাহোক তিনি জামেয়া আহমদীয়া কানাডার প্রথম প্রিন্সিপাল ছিলেন। এরপর ২০০৯ সাল পর্যন্ত তিনি প্রিন্সিপাল হিসেবে জামেয়াতে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১০ সালে আমি তাকে কানাডার মিশনারী ইনচার্জ হিসেবে নিযুক্ত করি এবং ২০১৮ সাল পর্যন্ত তিনি নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি সর্বমোট ৫৯ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। তার অস্থায়ী ওয়াক্‌ফও স্থায়ী ওয়াক্‌ফই ছিল। অনুরূপভাবে মাওলানা সাহেব কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে বেশ কয়েকটি জলসা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তার বক্তৃতা আহমদী ও অ-আহমদী সবাই খুব পছন্দ করত। অত্যন্ত প্রভাববিস্তারী বক্তৃতা প্রদান করতেন। শ্রোতামণ্ডলীকে পুরোপুরি নিজের দিকে আকৃষ্ট করে নিতেন। ২০১৬ সালে তিনি আমার প্রতিনিধি হিসেবে গুয়াতেমালায় নূর হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর রাখার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এছাড়া তার বিভিন্ন তবলীগি প্রবন্ধ কানাডার ন্যাশনাল নিউজ, টরেন্টো স্টার এবং অটোয়া সিটিজেনের মতো পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতো। মাওলানা মুবারক নযীর সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন পুস্তক, যেমন– তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া এবং ফতেহ্ ইসলাম-এর ইংরেজি অনুবাদ করারও তৌফিক লাভ করেছেন। এছাড়া হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর গালফ ক্রাইসিস পুস্তকও তিনি অনুবাদ করেন।

তার স্বজনদের মাঝে তার স্ত্রী আমাতুল হাফিয নাযীর সাহেবা এবং তিন পুত্র ও দুই কন্যা অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি আমি বলেছি, তিনি অনেক গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন এবং একজন আদর্শস্থানীয় জীবন উৎসর্গকারী ছিলেন আর মুরব্বীদের জন্য এক বিশেষ দৃষ্টান্ত ছিলেন। তার জীবন ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার এক মূর্ত প্রতীক ছিল। সর্বদা জামা'তের সেবা ও যুগ খলীফার আনুগত্যকে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। যেমনটি আমি বলেছি, বক্তৃতা প্রদানের অসাধারণ দক্ষতা রাখতেন, উর্দূ এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই তিনি দক্ষতা রাখতেন। গভীর প্রভাববিস্তারী বক্তৃতা প্রদান করতেন। তার স্ত্রী আমাতুল হাফিয সাহেবা লিখেন, সারা জীবন পরম ধর্মভীরুতা ও খোদাভীতির সাথে অতিবাহিত করেছেন। জামা'তের একেকটি পয়সা বাঁচানোর চেষ্টা করতেন আর অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনযাপন করেছেন। সিয়েরা লিওন থেকে চলে আসার পরও সেখানকার অনেক গরীবদুঃখী মানুষকে স্থায়ীভাবে নীরবে সাহায্য করতেন। তিনি বলেন, তিনি সর্বোত্তম ওয়াকফে যিন্দেগী হওয়ার পাশাপাশি সর্বোত্তম স্বামী এবং অত্যন্ত স্নেহশীল পিতাও ছিলেন– আমি এ বিষয়ের সাক্ষী। সর্বদা চিন্তিত থাকতেন যে, জামা'ত আমার জন্য অনেক খরচ করছে, সুতরাং আমি কীভাবে জামা'তের কাজে লাগতে পারি? প্রায়ই এ কথা বলতেন যে, যুগ খলীফার অসন্তুষ্টি আমি কোনভাবেই সহ্য করতে পারব না। তার সন্তানদেরও অভিব্যক্তি রয়েছে। সবাই একথাই লিখেছে যে, আল্লাহ্ তা'লা এবং পরকালের প্রতি আমাদের পিতার দৃঢ় ঈমান ছিল। খেলাফতের আনুগত্য এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতি দৃঢ় আস্থা ছিল। অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'লার ওপর অনেক বেশি ভরসা করতেন। প্রায়ই বলতেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে কখনও পরিত্যাগ করবেন না এবং সর্বদা আমাকে সাহায্য করবেন আর তার সাথে আল্লাহ্ তা'লার আচরণও এমনই ছিল। যখন তিনি মিশনারী ইনচার্জ ছিলেন তখন আমীর সাহেব যেখানেই তাকে প্রেরণ করতেন সেখানেও, এছাড়া অবসর গ্রহণের পরও যখন তার স্বাস্থ্যের অবনতি হয় তখনও মাঝে মাঝে তাকে কাজে লাগানো হতো; তিনি যেখানেই যেতেন আর্থিক কুরবানীর আহ্বান করতেন আর প্রথমে তিনি নিজে অংশ নিতেন তারপর বাকি জামা'তকে অনুপ্রাণিত করতেন। যার কারণে মানুষের ওপর গভীর প্রভাব পড়ত।

তার বড় মেয়ে বলেন, আহমদীয়া খেলাফতের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রাখার পরামর্শ দিতেন। আমাদের মধ্যে সর্বদা তিনি জামা'তী ব্যবস্থাপনার প্রতি ভালবাসা ও মর্যাদা সৃষ্টির চেষ্টা করতেন। তার ইচ্ছা ছিল আমরা যেন সর্বদা খলীফাতুল মসীহ্‌র প্রতিটি নির্দেশের ওপর আমল করি। তিনি বলেন, এমন বৈঠক খুব কমই হতো যেখানে এসব বিষয়ের তাগাদা দিতেন না। যখনই নাতি-নাতনী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী একত্রিত হতো তারা জানত যে, তিনি আমাদেরকে বসিয়ে উপদেশ দিবেন। তার উপদেশে সর্বদা এ বার্তা থাকত যে, আমাদের জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। এ বিষয়টি আমাদের নিশ্চিত করা উচিত যে, আমাদের সম্পর্ক আল্লাহ্ তা'লা ও খেলাফতের সাথে। তিনি বলেন, আমাদেরকে বলতেন, জামা'তের কাজ তো অবশ্যই সম্পন্ন হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। তোমরা যদি জামা'তের সেবা না করো তাহলে আল্লাহ্ তা'লা এর চেয়ে ভাল কাজ করার জন্য অন্য লোকদের নিয়ে আসবেন।

তার কনিষ্ঠ কন্যা একটি ঘটনা লিখেছেন, সিয়েরা লিওনে একটি মসজিদ নির্মাণের সময় শ্রমিকরা যখন মজুরী দাবি করে (নির্মাণ কাজ চলছিল আর টাকা শেষ হয়ে গিয়েছিল) তখন বাবার কাছে দেয়ার মতো কোন অর্থ ছিল না। মাওলানা মুবারক নযীর সাহেব তাদেরকে বলেন, আগামীকাল আসুন পারিশ্রমিক দিয়ে দেব। সকালবেলা তিনি, অর্থাৎ মুবারক নযীর সাহেব বাড়ির বাইরে বেরিয়ে দেখেন, শ্রমিকরা সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। কিন্তু তখনও অর্থের কোন সংস্থান হয় নি। ফলে তিনি শ্রমিকদেরকে বলেন, আমার কাছে এখন টাকা নেই; কিন্তু আমি দোয়া করছি, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্রই ব্যবস্থা করবেন। তিনি বলেন, এরই মধ্যে একটি গাড়ি দ্রুত গতিতে তার কাছে আসে এবং তাকে একটি খাম দেয় যার মধ্যে টাকা ছিল আর তাকে বলে, কোন ব্যক্তি শুনেছিল, আপনি মসজিদ নির্মাণ করছেন, তাই তিনি এ অর্থ পাঠিয়েছেন, এটি রেখে দিন। কে টাকা দিয়েছে– একথা জিজ্ঞেস করার পূর্বেই খাম দিয়ে গাড়িটি দ্রুত চলে যায়। তিনি বলেন, এ বিষয়ে তার বিশ্বাস জন্মে যে, আল্লাহ্ তা'লা তার দোয়া গ্রহণ করেছেন। এভাবে এই অর্থ দিয়ে তিনি শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করে দেন।

অতএব এটি ছিল আল্লাহ্ তা'লার ওপর তার তাওয়াক্কুল (ভরসা) এবং তার সাথে আল্লাহ্ তা'লার আচরণ। এ ধরনের তাওয়াক্কুল ও তার সাথে আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারের আরও অনেক ঘটনা রয়েছে যা বিভিন্ন লোক লিখেছে, মুরব্বীরাও লিখেছেন। যেমনটি আমি বলেছি, নিশ্চয় তিনি একজন 'সৎকর্মশীল আলেম' ছিলেন। এজন্যই লোকদের ওপর তার বক্তৃতার অনেক প্রভাব পড়ত। কিন্তু খেলাফতের সম্মুখে তিনি ছিলেন পরম বিনয়ী।

আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানসন্ততি ও বংশধরদের তার পদাঙ্ক অনুসরণকারী করুন। তার সন্তান ও বংশধরদেরকে তার দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা ক্রমাগতভাবে জামা'তকেও তার মতো নিঃস্বার্থ সেবক দান করতে থাকুন। বিশেষভাবে কানাডা জামেয়া থেকে যারা পাশ করেছে এমন মুরব্বীরা কীভাবে তিনি তরবিয়্যত করতেন, কীভাবে তবলীগ করা শিখিয়েছেন, কীভাবে নৈতিক শিক্ষা দিয়েছেন, কীভাবে ধর্ম শিখিয়েছেন, তার সাথে সম্পর্কযুক্ত অনেক ঘটনা লিখেছেন। যাহোক সেসব মুরব্বী অনেক কল্যাণ লাভ করেছেন। তাদের মনে রাখতে হবে যে, এসব ঘটনা কেবল স্মরণ রাখা বা বর্ণনা করার জন্য যেন না হয়, বরং এসব মুরব্বীকেও এসবের ব্যবহারিক চিত্র হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও তৌফিক দান করুন। *(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)*

পাক্ষিক **'আহ্‌মদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহ্‌মদী'**র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে **'আহ্‌মদী'** পত্রিকা পড়তে Log in করুন **www.theahmadi.org**

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী'র নতুন ই-মেইল আইডি–

pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

২৫ মার্চ, ২০২২ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

বিষয়:

'মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস'

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

দুদিন পূর্বে ২৩ মার্চ-এর দিন ছিল। জামা'তের মাঝে এ দিনটি 'মসীহ্ মাওউদ দিবস' নামে পরিচিত। এদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সর্বপ্রথম বয়আত নিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ দিনটি উপলক্ষে জামা'তে বিভিন্ন সভা-সমাবেশও অনুষ্ঠিত হয় যেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবি এবং যুগের নিরিখে তাঁর আগমনের প্রয়োজনীয়তা, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী, তাঁর জীবনচরিতের বিভিন্ন আঙ্গিক ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়। যুগের চাহিদা অনুসারে তাঁর আগমনের গুরুত্ব সম্পর্কে এক স্থানে তিনি এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা অনেক কৃপা করেছেন এবং স্বীয় ধর্ম, অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম এবং মহানবী (সা.)-এর সমর্থনে আত্মাভিমান প্রদর্শন করে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছেন যিনি তোমাদের মাঝে কথা বলছেন যেন তিনি সেই জ্যোতির প্রতি মানুষকে আহ্বান করেন। (এই) যুগে যদি এমন ফিতনা ও নৈরাজ্যের উদ্ভব না ঘটত এবং ধর্মকে মিটিয়ে দেয়ার যেসব অপচেষ্টা চলছে তা না হতো তাহলে কোন সমস্যাই ছিল না। এরপর আর কাউকে প্রেরণের প্রয়োজন হতো না। কিন্তু এখন তোমরা দেখছ যে, ডান-বাম সর্বত্রই ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সকল জাতি উঠেপড়ে

লেগেছে। সবদিকে, অর্থাৎ ডান-বাম যেদিকেই দেখ একই (ষড়যন্ত্র) যে, কীভাবে ইসলামকে ধ্বংস করা যায়। যখন তিনি দাবি করেন তখনও এ অবস্থাই বিরাজ করছিল এবং এ চেষ্টাই করা হচ্ছিল আর এখনও সেই একই অবস্থা। কিন্তু মুসলমান হওয়ার দাবিদার অধিকাংশ লোকই এ বিষয়টি বুঝতে পারে না। যাহোক তিনি বলেন, বারাহীনে আহমদীয়াতেও আমি উল্লেখ করেছি যে, ইসলামের বিরুদ্ধে ছয় কোটি পুস্তক রচনা ও সংকলনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু অদ্ভুত বিষয় হল, ভারতবর্ষের মুসলমানদের সংখ্যাও ছয় কোটি (অর্থাৎ যখন তিনি একথা বলেছেন তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ছয় কোটি) আর ইসলামের বিরুদ্ধে রচিত পুস্তকের সংখ্যাও একই। এসব রচনার বাড়তি যা রয়েছে তা যদি ছেড়েও দেয়া হয় তবুও আমাদের বিরোধীরা একটি করে পুস্তক পাক-ভারতের প্রত্যেক মুসলমানের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। যদি আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমান জাগ্রত না হতো এবং إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ – এর প্রতিশ্রুতি সত্য না হতো তাহলে নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, পৃথিবীর বুক থেকে ইসলাম উঠে যেত এবং এর নাম-চিহ্নও মুছে যেত। কিন্তু না, এমন হওয়া সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ্ তা'লার গুপ্ত হাত এর সুরক্ষা করছে। স্বীয় দাবির পর তিনি (আ.) একথা বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন কীভাবে তাঁর সাথে রয়েছে আর পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'লার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ তাঁর সপক্ষে কীভাবে পূর্ণ হচ্ছে এবং নিজ মাহ্‌দী ও মসীহ্‌র সমর্থনে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ কীভাবে পূর্ণ হচ্ছে। যেমনটি আমি বলেছি, (এ সংক্রান্ত) বিভিন্ন সভা হয়ে থাকে তাতে আপনারা এসব কথা শুনে থাকবেন, এম.টি.এ.তে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে সেখানেও শুনে থাকবেন এবং এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও হয়ে থাকবে– এসব কথা শ্রোতামণ্ডলীর শোনা উচিত। এখন আমি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বর্ণিত কিছু কথা তুলে ধরব। এগুলো সেসব ঘটনা বা বিষয় যা হযরত মুসলহ্ মাওউদ (রা.) স্বয়ং দেখেছেন, অথবা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছ থেকে শুনেছেন, কিংবা কোন কোন বর্ণনাকারী তাঁকে শুনিয়েছেন যারা নিজেরা তা দেখেছেন। এসব বর্ণনাকারীর মাঝে আপন ও পর উভয়েই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এসব ঘটনা একদিকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা উপস্থাপন করে আর অপরদিকে আমাদের সংশোধন এবং নিজেদের ঈমানের দৃঢ়তা (অর্জনের) প্রতিও মনোযোগী করে। এগুলো শুনে যদি আমাদের সংশোধন এবং উন্নতি করার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি না হয় তাহলে এগুলো শুনে কোনো লাভ নেই। এজন্য এ দৃষ্টিকোণ থেকে এসব কথা আমাদের শোনা উচিত আর এখনও শুনুন যাতে আমরা আমাদের ঈমানকে দৃঢ় করতে পারি এবং এগুলোকে আমরা আমাদের ঈমান দৃঢ় করার মাধ্যম বানাতে পারি।

নবীদের বিরোধীদের সর্বদাই এই অভিযোগ ছিল যে, তারা যে জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের কথা বলেন তা তাদেরকে অন্য কেউ শিখিয়ে দেয়। এমনকি মহানবী (সা.)-এর প্রতিও পবিত্র কুরআন সম্পর্কে এই আপত্তি রয়েছে যে, তাঁকে অন্য কেউ শিখিয়ে দিত (নাঊযুবিল্লাহ্)। অথচ এটি সেই মহাগ্রন্থ যার কোনো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা সম্ভব নয়– এটি আল্লাহ্ তা'লার চ্যালেঞ্জ। অতএব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে আমি উল্লেখ করছি যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) 'বারাহীনে আহমদীয়া' লিখার সময় সূচনাতেই লিখেন, আমি (এটি) এত সংখ্যায় লিখব। কিন্তু এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাকে প্রত্যাদিষ্টের মর্যাদা দান করলে তিনি (আ.) বলেন, এই বিষয়টি এখন আল্লাহ্ তা'লা নিজ হাতে নিয়ে নিয়েছেন, এ কাজের দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'লা নিজ হাতে তুলে নিয়েছেন। পরিস্থিতি অনুসারে তিনি যে বিষয়বস্তু শিখাতে থাকবেন আমিও তা-ই বর্ণনা করতে থাকব। তখন বিরোধীরা এই আপত্তি উত্থাপন করে যে, তাঁকে অন্য কেউ লিখে দিত আর তিনি (আ.) তা বর্ণনা করতেন। এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাঁর এক বক্তৃতায় বলেন, সেই যুগে 'জমিদার' এবং 'এহসান' নামে দুটি পত্রিকা ছিল।

এ দুটি বিরোধী পত্রিকা একথাও লিখতে থাকে যে, মৌলবী চেরাগ দ্বীন হায়দ্রাবাদী নামে কেউ একজন ছিলেন আর তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে এসব প্রবন্ধ লিখে পাঠাতেন যা তিনি (আ.) বারাহীনে আহমদীয়ায় ছাপিয়েছেন আর যতদিন পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে প্রবন্ধ আসা অব্যাহত ছিল তিনি (আ.) পুস্তক লিখতে থাকেন। কিন্তু যখনই তিনি প্রবন্ধ পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছেন তখন তাঁর পুস্তক লেখাও শেষ হয়ে গেছে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি বুঝতে পারি না যে, মৌলবী চেরাগ আলী সাহেবের কী হয়েছে? মানুষ যে বলে, তিনি লিখে দিতেন, (কাজেই) তার কী হয়ে গেছে যে, তিনি ভাল ভাল যেসব নিগূঢ়তত্ত্ব চিন্তা করেন তা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে লিখে পাঠিয়ে দেন কিন্তু আশপাশের সাধারণ বিষয়গুলো নিজের কাছে রেখে দেন। মৌলবী চেরাগ আলী সাহেবই যদি (সত্যিকার) প্রণেতা হয়ে থাকেন তাহলে বারাহীনে আহমদীয়ার বিপরীতে তার পুস্তকগুলো রেখে দেখা যাক। তার কিছু পুস্তক রয়েছে সেগুলোকে বারাহীনে আহমদীয়ার বিপরীতে রেখে দেখুন! এগুলোর মধ্যে কি আদৌ কোন সম্পর্ক রয়েছে? কোথায় বারাহীনে আহমদীয়া আর কোথায় তার লেখনী। তাহলে কী কারণ যে, অন্যকে তো তিনি এমন প্রবন্ধ লিখে দিতে পারতেন যার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না কিন্তু যখন

নিজের নামে কোন প্রবন্ধ প্রকাশ করতে গিয়েছেন তখন তাতে সেই বিষয়টিই সৃষ্টি হয় নি। অতএব প্রথম বিষয় হল, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রবন্ধ লিখে পাঠানোর তার কী প্রয়োজন ছিল আর যদি পাঠাতেনই তাহলে উত্তম জিনিস নিজের কাছে রাখতেন এবং সাধারণ জিনিস অন্যকে দিতেন। যেভাবে যওক সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, যওক নামের এক কবি ছিলেন তার সম্পর্কে সবাই জানে যে, তিনি জাফরকে, অর্থাৎ বাহাদুর শাহ্ জাফরকে কবিতা লিখে দিতেন। অথচ 'দিওয়ানে যওক' এবং 'দিওয়ানে জাফর' এখন দুটোই পাওয়া। সেগুলো দেখলে সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয় যে, যওকের কথার মধ্যে যে বাগ্মিতা ও গভীরতা রয়েছে তা জাফরের কথায় নেই। এ থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, তিনি যদি জাফরকে কোন জিনিস দিতেন তাহলে তা তার উদ্বৃত্ত হতে দিতেন আর ভাল জিনিস দিতেন না। যদিও জাফর বাদশাহ্ ছিলেন। মোটকথা প্রত্যেক বিবেকবান মানুষ এটি বুঝতে পারবে যে, মৌলবী চেরাগ আলী যদি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রবন্ধ লিখে পাঠাতেন তাহলে তার উচিত ছিল তত্ত্বজ্ঞানের উৎকৃষ্ট বিষয়গুলো নিজের কাছে রাখা এবং সাধারণ জ্ঞানের কথাগুলো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে লিখে দেয়া। কিন্তু মৌলবী চেরাগ আলী সাহেবের বইপুস্তকও রয়েছে আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকপুস্তিকাও আছে। এখন সেগুলো সামনাসামনি রেখে দেখুন– সেগুলোর মধ্যে কোনক্রমেই তুলনা করা যায় না। তিনি, অর্থাৎ মৌলবী চেরাগ আলী সাহেব তো তার পুস্তকগুলোতে বাইবেলের উদ্ধৃতি জমা করে রেখেছেন। কিন্তু অপরদিকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পবিত্র কুরআনের সেসব তত্ত্বজ্ঞান উপস্থাপন করেছেন যা বিগত তেরোশ বছরে কোন মুসলমান চিন্তাও করে নি। এসব মা'রেফত ও তত্ত্বজ্ঞানের শত ভাগের এক ভাগ, বরং সহস্র ভাগের এক ভাগও তার বইপুস্তকে নেই।

এরপর অন্য যেসব মৌলবী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে হইচই করে থাকে সেসব মৌলবী ও বিরুদ্ধবাদীর হইচই এবং বিরোধিতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) একস্থানে বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন দাবি করেন তখন তাঁর এবং তাঁর অনুসারীদের অবস্থা বাহ্যিকভাবে খুবই দুর্বল ছিল। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবির পূর্বে আমার জন্ম হয়। আমি প্রারম্ভিক যুগ না দেখলেও এর নিকটতম যুগ দেখেছি, অর্থাৎ বুঝদার হওয়ার পর। সে যুগও জামা'তের দুর্বলতার যুগ ছিল। মৌলবীরা মানুষকে বিভিন্নভাবে উত্তেজিত করতো এবং সম্ভব্য সকল পন্থায় দুঃখকষ্ট দিত, কিন্তু কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে নি। আল্লাহ্ তা'লার যেসব কাজ ছিল তা হতে থাকে।

এরপর যেসব বিরোধিতা হচ্ছিল সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কী প্রতিক্রিয়া ছিল– (এ সম্পর্কে) হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে আমি অনেক বার শুনেছি, মানুষ যখন গালি দেয় তখনও (একথা ভেবে) খারাপ লাগে যে, মানুষ আমাদের গালি দিয়ে কেন তাদের পরকাল নষ্ট করছে? আবার গালি না দিলেও আমার কষ্ট হয়, কেননা বিরোধিতা ছাড়া জামা'তের উন্নতি হয় না। গালি দেয়ার ফলে এই বিরোধিতার কারণে জামা'তের বার্তা (অন্যের কাছে) পৌঁছে যায়। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, অতএব গালি শুনেও আমাদের ভাল লাগে, তাই নানাবিধ আপত্তি কিংবা মানুষের গালমন্দের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা উচিত নয়।

পুনরায় তিনি (রা.) পাঞ্জাবী ভাষার একটি প্রবাদ বাক্য বর্ণনা করেন যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন আর সেটি হল 'উঠ উড়ান্দে ই লাদ্দে জান্দে নে', অর্থাৎ উট চিৎকার করতে থাকলেও মালিক তার পিঠে হাত বুলিয়ে মালামাল চাপিয়েই দেয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) উপদেশ দিয়ে বলেন, অনুরূপভাবে মানুষ যা-ই বলুক না কেন তোমরা নম্রতা ও প্রীতিপূর্ণ আচরণ কোরো, আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করবেন। এসব লোকের মধ্য থেকেই মান্যকারীরা সৃষ্টি হবে। এসব বিরোধিতা সম্পর্কে একস্থানে তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন দাবি করেন তখন অল্পকিছু মানুষই তাঁর মান্যকারী ছিল। কিন্তু এরপর আথমের সাথে যখন মুবাহাসা হয় তখন মানুষ একটি পরীক্ষায় পড়ে যায় আর তারা মনে করে তাঁর (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী আক্ষরিকভাবে পূর্ণ হয় নি। এরপর লেখরামের সাথে তাঁর মোকাবিলা হয়। তখন তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত প্রতাপের সাথে পূর্ণ হলেও হিন্দুদের মাঝে তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে আর তারা তাঁর ভীষণ বিরোধিতা আরম্ভ করে। অনুরূপভাবে যখন মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীর ফতোয়ার যুগ আসে তখনও জামা'তের ওপর বড় বিপদ নেমে আসে। এরপর যখন ডাক্তার আব্দুল হাকীমের ধর্মত্যাগের যুগ আসে তখন জামা'ত আরেক বিপদের সম্মুখীন হয়। মোটকথা, বিভিন্ন সময় এমন প্রবলভাবে বিরোধিতার ঝড় ওঠে, যারা দেখেছে তারা ধরে নিয়েছে যে, এখন এরা, অর্থাৎ জামা'ত ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু খোদা তা'লা এই সমস্ত বিপদ বা ঝামেলা দূর করার উপকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন আর সেসব ফিতনা জামা'তকে ধ্বংস করার পরিবর্তে জামা'তের উন্নতি ও সম্মানের কারণে পরিণত হয়েছে আর আজও এমনটি হচ্ছে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, তোমরা দেখে নাও, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর যুগেও বিরোধিতার ঝড় উঠেছিল, জামা'তের

বিরুদ্ধে কীরূপ বিরোধিতা সৃষ্টি হয়েছে, নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে আর মানুষ কীরূপে ধরে নিয়েছে যে, এখন এই জামা'ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে ও প্রতিবার এ জামা'ত ধ্বংস হওয়ার পরিবর্তে খোদা তা'লার অপার কৃপায় পূর্বের তুলনায় অধিক উন্নতি করেছে। মোটকথা, এই হল জামা'তের ইতিহাস আর ঐশী জামা'তের ইতিহাস এমনই হয়ে থাকে। বিরোধিতার এই ধারাও অব্যাহত থাকে। এখনও এমনই হয় আর এসব বিরোধিতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেই জামা'ত উন্নতি করতে থাকে আর এখনও ইনশাআল্লাহ্ উন্নতি করবে আর করছেও বটে। বিরুদ্ধবাদীরাও বলপ্রয়োগ প্রচেষ্টা করে, মুনাফেকরাও সর্বাত্মক চেষ্টা করে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আপন কাজ অবশ্যই পূর্ণ করেন। আল্লাহ্ যে কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা তিনি পূর্ণ করেই ছাড়বেন, ইনশাআল্লাহ্।

বিরোধিতা সম্পর্কে এক বক্তৃতায় তিনি আরও বলেন, এর একটি দিক এটিও রয়েছে যে, মানুষের মাঝে বৈরিতা থাকে আর এসব বৈরিতার কারণে তারা আমাদের কথা শোনার প্রতি মনোযোগী হয় না। তাদের হৃদয়ে ক্রোধের সৃষ্টি হয়। এ জিনিস আমাদের জন্য ক্ষতির কারণই হয়ে থাকে। কিন্তু এর আরেকটি দিকও আছে আর তা হল, কোন ব্যক্তি যখন বিরোধিতামূলক কোনো কথা শুনে তখন তারা যাচাই করতে উৎসুক হয় যে, আচ্ছা! এরা কতটা নোংরা লোক তা আমিও গিয়ে দেখি। আর তারা যখন যাচাই করে দেখে তখন তারা হতবাক হয়ে যায় যে, তারা আমাকে যেসব কথা বলেছিল আসল বিষয় তো সম্পূর্ণ ভিন্ন। অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীরা যা বলেছিল তা তো আহমদীদের কথা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর এভাবে তারা হেদায়েত তথা সত্যকে গ্রহণ করে নেয়। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি ছোট ছিলাম কিন্তু আমার মনে আছে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মসজিদে বসা ছিলেন, সেখানে বৈঠক চলছিল। রামপুর থেকে এক ব্যক্তি আসে। তিনি মূলত লখনৌ বা তার আশপাশের অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু থাকতেন রামপুরে। উচ্চতায় খাট, হালকা পাতলা গড়নের মানুষ ছিলেন; সাহিত্যিক ও কবিও ছিলেন। তাকে রামপুরের নবাব সাহেব উর্দূ প্রবাদের অভিধান লেখার দায়িত্বে নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। এই ব্যক্তি এসে উক্ত বৈঠকে বসেন এবং নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, আমি রামপুর থেকে এসেছি আমি নবাব সাহেবের দরবারের পরিচারক। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, এখানে আসতে আপনাকে কে প্রেরণা যুগিয়েছে? তিনি বলেন, আমি বয়আত গ্রহণ করতে এসেছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আপনাদের ওই দিকে তথা রামপুরের দিকে তো আমাদের জামা'তের সদস্য খুবই কম আর সেদিকে তবলীগও অনেক কম হয় আপনাকে এদিকে আসতে কে প্রেরণা যুগিয়েছে? হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এই বাক্যটি আজও আমার কানে ধ্বনিত হচ্ছে আর আমি আজও সেকথা ভুলতে পারি নি অথচ তখন আমার বয়স ছিল ১৬ বছর। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রশ্নের উত্তরে তিনি অবলীলায় বলেন, এখানে আসতে আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে মৌলবী সানাউল্লাহ্ সাহেব। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমার স্বল্প বয়সের কারণে আমি তার কথা বুঝতে পারি নি, কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার উত্তর শুনে হেসে ওঠেন এবং বলেন, তা কীভাবে? উত্তরে তিনি বলেন, মৌলবী সানাউল্লাহ্ সাহেবের বইপুস্তক নবাব সাহেবের দরবারে এসেছিল, নবাব সাহেব সেসব বই পড়তেন এবং আমাকেও পড়ার জন্য বলা হয়। তখন আমি স্থির করি এই ব্যক্তি যেসব উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছে আমি মির্যা সাহেবের পুস্তকাদি থেকে তা বের করে আসল উদ্ধৃতি দেখে নিব। আমি ভাবলাম এভাবে আমি আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে অনেক ভাল তথ্য-উপাত্ত একত্র করে ফেলব। কিন্তু যখন আমি উদ্ধৃতিগুলো বের করে পড়া আরম্ভ করি তখন বুঝতে পারি এগুলোর বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। এতে আমার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায় আর আমি ভাবলাম পূর্বাপর আরও কিছু পৃষ্ঠা পড়ে ফেলি। আমি যখন সেগুলো পড়ি তখন অবগত হই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যে মান-মর্যাদা ও মাহত্ম্য মির্যা সাহেব বর্ণনা করেন তা এই বিরোধীদের হৃদয়ে মোটেই নেই। এরপর তিনি বলেন, ফার্সীর প্রতি আমার আগ্রহ ছিল। ঘটনাক্রমে ফার্সী দুররে সামীন আমার হস্তগত হয়। আমি তা পাঠ করি। আমি যখন এটি পাঠ করা আরম্ভ করি তখন আমার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয়ে যায় আর আমি সিদ্ধান্ত নিই যে, গিয়ে বয়আত করে নিব।

তাই বিরোধিতা একদিকে বিশৃঙ্খলার কারণ হয় অপরদিকে এর মাধ্যমে উপকারও হয়। তাই এ উভয় অবস্থাকে দৃষ্টিপটে রেখে আমাদের উচিত নিজেদের তবলীগের পরিকল্পনা গ্রহণ করা। নবীর বিরোধিতা না হলেও তারা বিচলিত হয়ে পড়েন, কেননা বিরোধিতাই উন্নতির মাধ্যম যেমনটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন।

এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একস্থানে বলেন, মিশরীয় সাম্রাজ্য নিজ যুগে অত্যন্ত খ্যাতনামা পরাশক্তি ছিল। আর এর সম্রাট নিজ শক্তি ও ক্ষমতায় গর্ব করতো। অর্থাৎ ফেরাউনের যুগের কথা বলা হচ্ছে। এমন বাদশাহ্‌র বিপরীতে হযরত মূসা (আ.)-এর কোন যোগ্যতাই ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যখন বাদশাহ্‌র কাছে যান, বাদশাহ্ তাকে হুমকি-ধমকি দেয় আর তাঁকে ও তাঁর জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার সংকল্প ব্যক্ত করে আর

বলে, তুমি যদি বিরত না হও তাহলে তোমাকে ও তোমার জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও হযরত মূসা (আ.) বিরত হন নি, বরং তিনি বলেন, যে বার্তা পৌঁছানোর দায়িত্ব খোদা তা'লা আমাকে দিয়েছেন তা আমি অবশ্যই পৌঁছাব। পৃথিবীর কোন শক্তি আমার কাজে বাধ সাধতে পারবে না। একই অবস্থা হযরত ঈসা (আ.)-এর ছিল আর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অবস্থাও এমনই ছিল। হযরত মুসলেহ্ মৃওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিষয়েও আমরা একই অবস্থা দেখেছি। সব জাতি তার বিরোধী ছিল, এক অর্থে সরকারও তার বিরোধী ছিল। যদিও পরবর্তীতে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। যাহোক সব জাতি তার বিরোধী ছিল। সকল ধর্মের অনুসারীরা তার বিরোধী ছিল। মৌলবীরা তার বিরোধী ছিল। গদ্দিনশীন পীররা তার বিরোধী ছিল। জনসাধারণ তার বিরোধী ছিল। ধনী ও বিশিষ্ট্য ব্যক্তিবর্গ সবাই তার শত্রু ছিল। এক কথায় চতুর্দিকে বিরোধিতার এক ঝড় বিরাজমান ছিল। লোকজন তাকে অনেক বুঝিয়েছে। কেউ কেউ বন্ধু প্রতীম হয়ে তাকে বলেছে, আপনি আপনার দাবিসমূহের মাত্রা কিছুটা হ্রাস করুন। কেউ কেউ বলেছে, আপনি যদি অমুক অমুক কথা পরিত্যাগ করেন তবে সবাই আপনার জামা'তের অর্ন্তভুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু এসব কথার প্রতি তিনি কোন ভ্রুক্ষেপ করেন নি বরং সর্বদা তার দাবিসমূহ সুস্পষ্টরূপে উপস্থাপন করতে থাকেন। আর এর ফলে হইচই ও আলোড়ন হতে থাকে, অত্যাচার-নিপীড়ন হতে থাকে। হত্যাকাণ্ড চলতে থাকে। কিন্তু এমন অত্যাচার-নিপীড়ন সত্ত্বেও আর তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এমন এক জগতের সাথে ছিল যার সাথে লড়াই করার জাগতিক উপায়-উপকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর কোন ক্ষমতাই ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এই মোবাবিলা অব্যাহত রাখেন।

আমার ভালভাবে স্মরণ আছে, আমি বহুবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে বলতে শুনেছি, নবীর দৃষ্টান্ত ঠিক তেমনই যেমনটি লোকেরা বলে যে, এক গ্রামে এক আত্মভোলা বা উন্মাদ নারী ছিল। সে যখন বাইরে বের হতো তখন ছোট ছোট ছেলেরা একত্রিত হয়ে তাকে উত্যক্ত করতো। তাকে উপহাস করতো। তাকে বিরক্ত করতো, তাকে নিয়ে কৌতুক ও হাসিঠাট্টা করতো। প্রতিনিয়ত তাকে বিরক্ত করতো। অপরদিকে সেই নারীও সেই ছেলেদের গালি দিত আর বদদোয়া করতো। অবশেষে গ্রামবাসী নিজেদের মাঝে পরামর্শ করে যে, এই নারী অত্যাচারিত আর আমাদের ছেলেমেয়েরা অযথা বা অন্যায়ভাবে তাকে বিরক্ত করে। অত্যাচারিত অবস্থায় সে তাদেরকে বদ্‌দোয়া দেয়। পাছে তার বদ্‌দোয়া কবুল হয়ে যায়। আমাদের উচিত, আমাদের ছেলেমেয়েদের বিরত রাখা, এর ফলে তারা তাকে বিরক্তও করবে না আর সেই নারী তাদেরকে বদ্‌দোয়াও দিবে না। সুতরাং এই পরামর্শের পর তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, আগামীকাল থেকে গ্রামবাসীরা তাদের ছেলেদেরকে ঘরে আটকে রাখবে এবং তাদেরকে বাইরে বের হতে দিবে না। সুতরাং পরদিন সবাই তাদের ছেলেদের বলে দেয় যে, আজ থেকে বাইরে বের হবে না এবং অধিক সতর্কতাস্বরূপ তারা বাইরে থেকে দরজার শিকল লাগিয়ে দেয়। যখন সকাল হয় আর সেই উন্মাদ নারী প্রতিদিনের ন্যায় নিজ ঘর থেকে বের হয়, তখন কিছু সময় সে এদিক-সেদিক অলিগলিতে ঘুরে বেড়াতে থাকে। কখনও এক গলিতে যায় আবার কখনও অন্য গলিতে। কিন্তু সে কোন ছেলেকে দেখতে পায় না। এর আগে এমন হতো যে, কোন ছেলে তার আঁচল ধরে টানছে, কেউ তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করছে, কেউ তাকে ধাক্কা দিচ্ছে, কেউ তার হাত ধরে রেখেছে আর কেউ তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে। কিন্তু আজ সে কোন ছেলে দেখতে পায় নি। দুপুর পর্যন্ত সে অপেক্ষা করে। কিন্তু সে যখন দেখে যে, কোন ছেলে এখন পর্যন্ত ঘর থেকে বের হয় নি তখন সে বিভিন্ন দোকানে যায় আর প্রত্যেক দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করে যে, আজকে কি তোমাদের ঘর ভেঙে পড়েছে, বাচ্চারা কি মারা গিয়েছে, আসলে হয়েছে কী যে, তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না? কিছুক্ষণ পর সে যখন এভাবে প্রত্যেক দোকানে গিয়ে এই কথা বলতে থাকে তখন লোকজন বলে যে, গালমন্দ তো এখনও শুনতে হচ্ছে, বদ্‌দোয়া তো এখনও দিচ্ছে আর ছেলেরা যখন তাকে বিরক্ত করতো তখন এমনই শুনতে হতো। তাই বাচ্চাদেরকে ছেড়েই দাও। তাদেরকে বন্দি করে কেন রেখেছ? হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই গল্প শুনিয়ে বলতেন, এক দৃষ্টিকোণ থেকে নবীদের অবস্থাও এমনই হয়ে থাকে; মানুষ তাঁদেরকে উত্যক্ত করে, বিরক্ত করে, তাঁদের প্রতি অত্যাচার-নিপীড়ন করে এবং এরূপ অত্যাচার-নির্যাতন করে যে, তাঁদের জন্য জীবন-ধারণ করা কঠিন হয়ে যায়। আর এক শ্রেণীর মানুষের হৃদয়ে এই অনুভূতি সৃষ্টি হতে থাকে যে, মানুষ অত্যাচার-নির্যাতন করছে, তাদের এমনটি করা উচিত নয়। তিনি বলেন, কিন্তু তাঁরাও অর্থাৎ নবীগণও পৃথিবীবাসীকে ত্যাগ করতে পারেন না। পৃথিবীবাসী যখন তাঁদেরকে কষ্ট দেয়া বন্ধ করে দেয় তখন তাঁরা স্বয়ং তাদেরকে আলোড়িত করেন এবং জাগ্রত করেন, বাণী পৌঁছান, কোন কথা বলেন, তবলীগের প্রতি অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ করেন যেন পৃথিবীবাসী তাঁদের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে এবং তাঁদের কথা শুনে।

অতঃপর নবী রসূলের কঠোরতা প্রসঙ্গে বলা হয়ে থাকে যে, নবী-রসূলরা কেন কঠোরতা প্রদর্শন করেন? এ সম্পর্কেও তিনি (রা.) বলেন, নবী-রসূলরা নিজ সত্তার জন্য কঠোরতা করেন না, বরং

যদি কখনও কঠোরতা ও আত্মাভিমান প্রদর্শন করেও থাকেন তবে আল্লাহ্ তা'লার মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে করে থাকেন। (নতুবা) নিজ সত্তার বিষয়ে তাঁরা একান্ত বিনয়ী হয়ে থাকেন। এ সম্পর্কে তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একবার লাহোরের একটি গলিতে এক ব্যক্তি তাঁকে ধাক্কা দেয়। ফলে তিনি (আ.) পড়ে যান। এতে তাঁর সঙ্গীরা উত্তেজনার বশে তাকে মারতে উদ্যত হয়। কিন্তু তিনি (আ.) বলেন, সে নিজ উত্তেজনার বশে সত্যের প্রতি অনুরাগের কারণে এমনটি করেছে। এই ব্যক্তি মৌলবীদের কথা শুনে এটিই মনে করেছে যে, মির্যা সাহেব মিথ্যাবাদী তাই আমি আমার প্রতিশোধ গ্রহণ করি। সে সত্যের খাতিরে এমনটি করেছে, তাই তাকে কিছু বলো না। অতএব নবী-রসূলগণ ব্যক্তিস্বার্থের জন্য কোন কথা বলেন না, বরং খোদার সম্মান প্রতিষ্ঠাকল্পে বলেন। তাই এমন ধারণা করা উচিত নয় যে, আল্লাহ্'র নবীগণও এমন আচরণ করে থাকেন। অর্থাৎ যদি কখনও তাঁরা কঠোরতা প্রদর্শন করেও থাকেন, তাঁদের ও সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে। তাঁরা খোদা তা'লার জন্য করে থাকেন আর সাধারণ মানুষ নিজ ব্যক্তিস্বার্থে করে। অতএব তিনি (আ.) উপদেশ প্রদান করেন যে, যদি কারও মধ্যে এই অনুভূতি থাকে যে, আমি সত্যিকার অর্থে দুর্বল, তাহলে এমন ব্যক্তি কখনও পথভ্রষ্ট হতে পারে না। দুর্বলতার প্রতি তার সজাগ দৃষ্টি থাকবে। সে আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য চাইবে। মানুষ পথভ্রষ্ট তখন হয় যখন সে বিশ্বাস করে যে, আমি সত্যের ওপর রয়েছি আর এরপর তার মাঝে অহংকার সৃষ্টি হয়।

অতএব আমাদের নবীদের আদর্শকে দৃষ্টিপটে রেখে সর্বদা বিনয়ের প্রদর্শন করা উচিত আর এটিই পাপ থেকে আত্মরক্ষারও উপায়। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আরেকটি উদ্ধৃতি রয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হযরত মুআবিয়ার নামাযের ঘটনা বর্ণনা করতেন যে, একবার তার ফজরের নামায কাযা হয়ে যায়। কিন্তু এই ভুলের কারণে তিনি অধঃপতিত হন নি, বরং উন্নতি করেছেন। শয়তান তার ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে নি, বরং তিনি আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের চেষ্টা করেছেন। অতএব যার মাঝে পাপের অনুভূতি রয়েছে সে পাপ থেকে রক্ষা পায়। আর যখন পাপের অনুভূতি থাকে না তখন মানুষ (আরও) পাপে লিপ্ত হয়। অতএব মু'মিনের اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ –এর প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত আর এটি অনুধাবন করা উচিত যে, সে বিপদাপদ থেকে নিরাপদ হয়ে যায় নি। নিরাপদ কেবল তখনই হতে পারে যখন খোদার বাণী তাকে (একথা) অবগত করবে। অতএব মানুষের নিজ আত্মার দুর্বলতাসমূহ গণনা করা উচিত। এমন মানুষের জন্য আধ্যাত্মিকতার পথ উন্মুক্ত হয় যে নিজের (দুর্বলতা) গণনা করতে থাকে। যে ব্যক্তি এরূপ করে না তার জন্য আধ্যাত্মিকতার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। আর এমন মানুষ এরপর পথভ্রষ্ট হয়।

এক স্থানে তিনি বলেন, জাগতিক পরিশ্রম বা আধ্যাত্মিক পরিশ্রম ছাড়া কোন মানুষ সম্মান লাভ করতে পারে না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, বর্তমান যুগে সকল প্রকার সম্মান খোদা তা'লা আমার সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। এখন সম্মান লাভকারী হয় আমার অনুসারীরা হবে অথবা আমার বিরোধীরা হবে। সম্মানপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দেখ! হয় তারাই সম্মান লাভ করবে যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অনুসারী অথবা তারা (পাবে) যারা বিরোধিতা করে (আর) ধর্মীয় দিক থেকে নিজেদেরকে (কিছু একটা) মনে করে। অতএব তিনি অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, মৌলবী সানাউল্লাহ্ সাহেবকে দেখ! তিনি তেমন কোন বড় মৌলবী নন। তার ন্যায় হাজার হাজার মৌলবী পাঞ্জাব এবং হিন্দুস্তানে রয়েছে। তিনি যদি কোন বিশেষ সম্মান পেয়ে থাকেন তাহলে তা আমার বিরোধিতার কারণে। তারা এটি স্বীকার করুক বা না করুক, কিন্তু বাস্তবতা এটিই যে, আজ আমার বিরোধিতায় নতুবা অনুসরণেই সম্মান নিহিত। মোটকথা মূল কেন্দ্রবিন্দু হল আমার সত্তা। আর বিরোধীরাও যদি সম্মান পেয়ে থাকে তাহলে তা আমারই কারণে। অতএব আজও আমরা তা-ই দেখি। মৌলবীদের উপার্জনের ব্যবস্থা যদি হয়ে থাকে বা তারা যদি কোন সম্মান পেয়ে থাকে তাহলে তা আহমদীয়াতের বিরোধিতার কারণে। আর এখন তো রাজনীতিবিদরাও কোন কোন দেশে, বিশেষত পাকিস্তানে আহমদীয়াতের বিরোধিতার মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে যেন তাদের পদ বহাল থাকে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্র হয়েছে সেগুলোর উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধেও মানুষ ষড়যন্ত্র করেছে, হত্যা মামলা দায়ের করেছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বিরোধীদেরকে তাদের উদ্দেশ্যে সর্বদা বিফল করেছেন। এমনই এক হত্যাচেষ্টার মামলায় মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসেন আর এই আশা নিয়ে আসেন যে, মির্যা সাহেবের হাতে হাতকড়া পরানো না থাকলেও আদালতে তিনি নাউযুবিল্লাহ্ লাঞ্ছিত অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকবেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যে, সেই ইংরেজ ডেপুটি কমিশনার, যার সামনে মামলা উপস্থাপিত হয়েছিল, সে আমাদের জামা'তের বিরোধী ছিল আর জেলায় নিযুক্তি হতেই সে বলেছিল যে, এই ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ

(আ.), যে কিনা আমাদের ঈসা মসীহ্‌র সম্মানহানী করে তাঁর সম্পর্কে বলে যে, তিনি মারা গেছেন, এখন পর্যন্ত সুরক্ষিত রয়েছে! তাকে কেন (এখনও) শাস্তি দেয়া হয় নি? আমি এখন তাকে শাস্তি দিব। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন তার সামনে উপস্থিত হন তখন আল্লাহ্ তা'লা এরূপ হস্তক্ষেপ করেন যে, তাঁর (আ.) চেহারা দেখতেই তার বিদ্বেষ দূর হয়ে যায় আর সে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বসার জন্য তাঁর পাশে চেয়ারের ব্যবস্থা করে দেয় আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাতে বসে পড়েন। মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেব, যিনি এসেছিলেনই এই উদ্দেশ্যে যে, তাঁকে (আ.) লাঞ্ছিত অবস্থায় দেখবেন, তিনি যখন দেখেন যে, তিনি (আ.) চেয়ারে উপবিষ্ট আছেন তখন সহ্য করতে না পেরে তিনি ডেপুটি কমিশনার কাপ্তান ডগলাস-এর কাছে দাবি করেন যে, আমাকেও চেয়ার দেয়া হোক। তিনি অর্থাৎ মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন সাহেব ভেবেছিলেন, অপরাধীর জন্য যদি চেয়ার দেয়া হয় তাহলে সাক্ষী কেন চেয়ার পাবে না। কিন্তু কাপ্তান ডগলাস যখন এই কথা শুনে তখন সে খুবই অসন্তুষ্ট হয় এবং ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, তোমাকে চেয়ার দেয়া হবে না। মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন সাহেব বলেন, আমার পিতাকে লর্ড সাহেবের দরবারে চেয়ার দেয়া হতো, (তাই) আমাকেও চেয়ার দেয়া হোক। আমি আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের এডভোকেট আর আমার চেয়ার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। তখন কাপ্তান ডগলাস বলে, বকবক করো না আর পিছনে সরে যাও এবং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাক। এখন তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অসম্মান দেখার পরিবর্তে খোদা তা'লা তাকেই লাঞ্ছিত করেছেন। এটি তো ছিল আদালত কক্ষের ভিতরের ঘটনা। মৌলবী সাহেব যখন বাহিরে আসেন তখন মানুষকে এটি দেখানোর জন্য যে, ভেতরেও তিনি চেয়ার পেয়েছিলেন, বারান্দায় রাখা একটি চেয়ারে তিনি বসে পড়েন। কিন্তু যেহেতু সেবকরা তা-ই করে থাকে যা তারা তাদের মালিককে করতে দেখে, চাপরাসি যখন দেখে যে, মৌলবী সাহেবকে ভেতরে চেয়ার দেয়া হয় নি আর এখন তিনি বারান্দায় এসে চেয়ারে বসে আছেন, তখন সে ভাবে যে, যদি সাহেব বাহাদুর এসে দেখে ফেলেন তাহলে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। তাই সে দৌড়ে এসে বলে, আপনার এখানে বসার অধিকার নেই, উঠে যান। এভাবে বাইরের লোকেরাও দেখতে পায় যে, মৌলবী সাহেব আদালতের ভিতরে কতটা সম্মান পেয়েছেন। মৌলবী সাহেব এতে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে সামনে এগিয়ে যান, সেখানে কোন এক ব্যক্তি চাদর বিছিয়ে রেখেছিল, তিনি তাতে বসে পড়েন। কিন্তু ঘটনাক্রমে চাদরের মালিকও তৎক্ষণাৎ চলে আসে এবং বলে, আমার চাদর ছেড়ে দাও, তোমার বসার কারণে এটি নোংরা হচ্ছে, কেননা তুমি একজন মুসলমানের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টানদের পক্ষ হয়ে আদালতে সাক্ষ্য দিতে এসেছ। অতএব স্মরণ রেখ! আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যখন সাহায্য আসে তখন কেউ তা প্রতিহত করতে পারে না। পুলিশের অফিসার বা সিপাহী তো দূরে থাক, বড় থেকে বড় মানুষের জীবনেরও কোন ভরসা নেই আর এক সেকেন্ডে আল্লাহ্ তা'লা শত্রুদের ধ্বংস করে দিতে পারেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিনত হও। আর তাঁরই কাছে দোয়া করো। হ্যাঁ, মু'মিনদের জন্য পরীক্ষা আসাও নির্ধারিত থাকে। অতএব যদি ধৈর্যের সাথে কাজ করো এবং দোয়া করো তাহলে আল্লাহ্ তা'লা সেসব পরীক্ষা দূর করে দিবেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং খ্রিষ্টানদের মাঝে একটি মুবাহেসা বা বিতর্ক হয়েছিল। তার যে বিবরণ রয়েছে তা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলীর মাঝে 'জঙ্গে মুকাদ্দাস' নামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই মুবাহেসা বা বিতর্কের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক স্থানে তাঁর খুতবায় বলেন যে, হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) বলতেন, এখানে তিনি হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-এর বরাতে কথা বলেন যে, আথমের সাথে মুবাহেসায় আমরা যে দৃশ্য দেখেছি তাতে প্রথমত আমরা হতভম্ব হয়ে যাই। অর্থাৎ তা দেখে প্রথমত আমরা হতভম্ব হয়ে যাই। আর দ্বিতীয়ত এতে আমাদের ঈমান আকাশসম উচ্চতায় উপনীত হয়। হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) বলতেন, খ্রিষ্টানরা যখন মুবাহেসা বা বিতর্কের ফলে ত্যক্ত হয়ে যায় আর তারা দেখতে পায় যে, আমাদের কোন কৌশল কাজে আসে নি, তখন কতিপয় মুসলমানকে নিজেদের সাথে নিয়ে হাসিঠাট্টা করার উদ্দেশ্যে তারা এই দুষ্টামি করে যে, কিছু অন্ধ, কিছু বধির এবং কিছু লুলা ও ল্যাংড়া ব্যক্তিদের একত্রিত করে আর তাদেরকে বিতর্কের পূর্বে একপাশে বসিয়ে দেয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আগমন করতেই তৎক্ষণাৎ তারা সেই অন্ধ, বধির ও লুলা-ল্যাংড়া ব্যক্তিদের তাঁর (আ.) সামনে উপস্থাপন করে বলে যে, (শুধু) কথায় বিরোধের নিষ্পত্তি হবে না। আপনি বলে থাকেন যে, আমি মসীহ্ নাসেরীর মসীল বা প্রতিচ্ছবি আর মসীহ্ নাসেরী অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি প্রদান করতেন, বধিরদের শ্রবণশক্তি ফিরিয়ে দিতেন এবং লুলা-ল্যাংড়াদের হাত-পা ভাল করে দিতেন। মসীহ্ নাসেরী তো এসব কাজ করতেন, আমরা আপনাকে কষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য এখানে কতক অন্ধ, বধির এবং লুলা ও খোঁড়াদের একত্রিত করেছি। আপনি যদি সত্যিই মসীহ্‌র মসীল বা প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকেন তাহলে এদেরকে সুস্থ করে দেখান। খলীফা আউয়াল (রা.) বলতেন, আমরা সেখানে বসা ছিলাম। তাদের একথা শুনে আমরা হতোদ্যম পয়ে পড়ি। যদিও আমরা

জানতাম যে, এগুলো কেবলই মনগড়া কথা, অর্থাৎ মসীহ্ নাসেরীর প্রতি যেসব কথা আরোপ করা হয় তাতে কোন সত্যতা নেই, তবুও আমরা হতোদ্যম হয়ে যাই। আমরা একারণে ঘাবড়ে যাই যে, আজ তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার সুযোগ পেয়ে যাবে, কিন্তু আমরা যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর চেহারার প্রতি তাকাই তখন দেখি যে, তাঁর চেহারায় অপছন্দ কিংবা অস্বস্তির কোন ছাপ নেই। তাদের কথা শেষ হলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, দেখুন পাদ্রী সাহেব! আমি যে মসীহ্‌র মসীল বা প্রতিচ্ছবি হবার দাবি করছি ইসলামী শিক্ষানুযায়ী তিনি এরূপ অন্ধ, বধির এবং লুলা-ল্যাংড়াদের সুস্থ করতেন না, কিন্তু আপনাদের বিশ্বাস হল, মসীহ্ দৈহিক দিক থেকে অন্ধ, বধির এবং লুলা ও ল্যাংড়াদের সুস্থ করতেন। এছাড়া আপনাদের কিতাবে এটিও লেখা আছে যে, তোমাদের মাঝে যদি বিন্দু পরিমাণ ঈমান থাকে আর তোমরা পাহাড়কে একস্থান থেকে আরেকস্থানে সরে যেতে বল তবে তা সরে যাবে এবং তোমরা যদি অসুস্থদের গায়ে হাত রাখ তবে তারা সুস্থ হয়ে যাবে। সুতরাং আমার কাছে এই দাবি করা যেতে পারে না। আমি তো সেসব মু'জিযা দেখাতে পারি যা আমার মনিব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) দেখিয়েছেন। আপনারা সেসকল মু'জিযা দেখানোর দাবি জানালে আমি তা দেখাতে প্রস্তুত আছি। বাকি রইল এ ধরনের মু'জিযা, সেক্ষেত্রে আপনাদের কিতাবে বলা আছে যে, প্রত্যেক সেই খ্রিষ্টান, যার মাঝে এক সরিষা পরিমাণ ঈমান রয়েছে, সে অনুরূপ মু'জিযা দেখাতে সক্ষম যেরূপ হযরত মসীহ্ নাসেরী দেখিয়েছেন। তাই আপনি খুব ভাল কথা বলেছেন যে, আমাদের কষ্ট করা থেকে বাঁচিয়েছেন এবং এই অন্ধ, বধির এবং লুলা ও খোঁড়াদের একত্রিত করেছেন। এখন এই অন্ধ, বধির এবং লুলা ও খোঁড়ারা উপস্থিত আছে, আপনাদের মাঝে যদি এক সরিষা পরিমাণ ঈমান থাকে তবে এদেরকে সুস্থ করে দেখিয়ে দিন। হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) বলতেন, আমরা দেখেছি যে, এই উত্তরে পাদ্রীদের এমন অবস্থা হয়েছে যে, বড় বড় পাদ্রীরা সেসব লুলা-ল্যাংড়াদের টেনে টেনে (সেখান থেকে) সরিয়ে নিচ্ছিল। অতএব আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্তদেরকে সকল ক্ষেত্রে সম্মান প্রদান করেন এবং তাঁদেরকে এমন এমন উত্তর শিখান যার ফলে শত্রুরা সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে যায়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরোধিতা সম্পর্কিত শিয়ালকোটের একটি ঘটনা তিনি (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) শিয়ালকোট গমন করলে মৌলবীরা ফতোয়া দেয় যে, তাঁর (আ.) বক্তৃতা শুনতে যারা যাবে তাদের বিয়ে ভেঙে যাবে, কিন্তু হযরত মির্যা সাহেবের (বক্তব্যের) আকর্ষণ এমন ছিল যে, মানুষ এই ফতোয়ারও কোন পরোয়া করে নি। তখন মৌলবীরা রাস্তায় প্রহরা বসায় যাতে মানুষকে যেতে বাধা দিতে পারে এবং রাস্তায় পাথর জমিয়ে রাখে যে, যারা এরপরও থামবে না তাদেরকে পাথর মারা হবে। এছাড়া তারা মাহফিল থেকে মানুষকে ধরে ধরে নিয়ে যেত যাতে মানুষ বক্তৃতা শুনতে না পারে। তিনি (রা.) বলেন, তখন বি.টি. সাহেব নামের একজন ছিলেন যিনি তৎকালে শিয়ালকোটের সিটি ইন্সপেক্টর ছিলেন আর পরবর্তীতে পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট হয়েছিলেন। বর্তমানে তার পদবী কি তা জানা নেই, অর্থাৎ যখন এটি বর্ণনা করা হচ্ছিল (তখনকার কথা)। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন সেই বি.টি সাহেব। মানুষ যখন হৈ চৈ আরম্ভ করে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় তখন হযরত সাহেবের বক্তৃতা যেহেতু তিনিও শুনেছিলেন তাই তিনি অবাক হন যে, এই বক্তৃতায় তো আর্যসমাজী এবং খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে কথা বলা হয়েছে আর মির্যা সাহেব যাকিছু বলেছেন তা যদি মৌলবীদের চিন্তাধারার বিপরীতও হয় তবুও এতে ইসলামের ওপর কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় না। এখানে তো খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়া হচ্ছে। আর উক্ত বক্তব্য যদি সত্য হয় তাহলে তাতে ইসলামের সত্যতা সাব্যস্ত হয়। [মির্যা সাহেব যা বলছেন তা যদি সত্য হয়, তাহলে তো ইসলামের সত্যতা সাব্যস্ত হয়।] তাহলে মুসলমানদের দাঙ্গা-ফ্যাসাদ করার কারণ কী? যদিও তিনি সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন তবুও তিনি জলসার মাঝে দাঁড়িয়ে যান এবং বলতে থাকেন, ইনি তো বলছেন যে, খ্রিষ্টানদের ঈশ্বর মারা গেছেন। তিনি মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেন, হে মুসলমানেরা! তোমরা কেন এতে ক্রোধান্বিত হচ্ছ? [তিনি তো এ কথাই বলছেন যে, খ্রিষ্টানদের ঈশ্বর মারা গেছেন; এতে তোমাদের ক্রোধান্বিত হওয়ার কী আছে? এ তো তোমাদের জন্য সুখবর!] মোটকথা তারা আমাদের সাথে এমনই ব্যবহার করে থাকে; [অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীরা।] আর বাহ্যত এটিই দেখা যায় যে, যদি এদের মাঝ থেকে মানুষ আর্যদের দলেও চলে যায়, তাতে আমাদের কী যায়-আসে! [অর্থাৎ মুসলমানদের মাঝে কেউ যদি আর্যদের দলেও যোগ দেয়, তাতে মুসলমানদের কিছু যায় আসে না। কিন্তু মির্যা সাহেবের কথা কেউ যেন না শোনে!] তিনি (রা.) বলেন, প্রকৃত বিষয় হল, এরূপ চিন্তাধারা ভুল। [কোন মুসলমান যদি ধর্ম পরিবর্তন করে তবে আমাদের যায়-আসে।] তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন,

اے دل تو نیز خاطر ایناں نگاہ دار
کاخر کنند دعوی حب پیمبرم

অর্থাৎ, হে আমার হৃদয়! তুমি এদের খেয়াল রেখো; কেননা আর যা-ই হোক, এরা আমার নবী (সা.)-কে ভালবাসার দাবি তো করে! (-ফার্সী পঙ্‌ক্তির অনুবাদ)

এই কারণে তাদের ধর্মান্তরিত হওয়াতে অথবা পথভ্রষ্ট হওয়াতে আমাদের হৃদয় অবশ্যই ব্যথিত হয়।

একদা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে এক ব্যক্তি বলে যে, আমি আপনাকে অনেক শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আপনার ডদয়ে অনেক বড় একটি ভুল হয়ে গেছে। আপনার জানা আছে, আলেমরা কারও কথা মানে না। কেননা তারা জানে যে, কথা মেনে নিলে তা আমাদের জন্য অপমানজনক হবে; মানুষ বলবে, এ বিষয়টি অমুক বুঝেছে, কিন্তু এরা (তথা মৌলবীরা) বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই তাদেরকে স্বীকার করানোর উপায় হল, তাদের মুখ দিয়েই যেন কথা বের করা হয়। আপনি যখন ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়টি অবগত হন, তখন আপনার উচিত ছিল, আপনি শীর্ষস্থানীয় আলেমদের নিমন্ত্রণ করতেন আর একটি মিটিং করে এ বিষয়টি তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করতেন যে, ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকার বিশ্বাসের মাধ্যমে খ্রিষ্টানদের অনেক সুবিধা হয় এবং তারা আপত্তি উত্থাপনের মাধ্যমে ইসলামের ক্ষতি করছে। তারা বলে, তোমাদের নবী মৃত্যুবরণ করেছে আর আমাদের ধর্মের প্রবক্তা আকাশে আছেন, তাই তিনি শ্রেষ্ঠ; বরং তিনি স্বয়ং ঈশ্বর-এর প্রত্যুত্তর দেয়া প্রয়োজন। যদি আপনি এই প্রশ্ন করতেন, তখন আপনার নিমন্ত্রণে আগত সেই আলেমরা একথাই বলতো যে, আপনিই বলুন; [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে বলতো যে, আপনিই বলুন- এর কী উত্তর হতে পারে?] তখন আপনি বলতে পারতেন, সিদ্ধান্ত তো আসলে আপনাদেরটাই সঠিক হওয়া সম্ভব; তবে আমার মতে অমুক আয়াত ডদয়ে হযরত মসীহ্র মৃত্যু সাব্যস্ত হতে পারে। আলেমরা তাৎক্ষণিকভাবে বলতো, আপনার এ কথা সঠিক। বিসমিল্লাহ্ বলে আপনি ঘোষণা দিন; আমরা আপনাকে সমর্থন দিতে প্রস্তুত। মৌলবীদের স্বীকার করানোর জন্য সেই ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে এই পদ্ধতি বলেন। তিনি আরও বলেন, এভাবে এই বিষয়টিও উত্থাপিত হতো যে, হাদীসে হযরত মসীহ্ (আ.)-এর পুনরাগমনের উল্লেখ আছে। কিন্তু মসীহ্ (আ.) যেহেতু মৃত্যুবরণ করেছেন, সেক্ষেত্রে ঐসকল হাদীসের কী অর্থ হবে? তখন কোন আলেম আপনাকে বলতো, আপনিই মসীহ্! আর সকল আলেম-ওলামা এ বিষয়ে সত্যায়নের সীল লাগিয়ে দিত। এই প্রস্তাব শুনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমার দাবি যদি মানবীয় চালাকি-প্রসূত হতো, তাহলে নিঃসন্দেহে আমি এমনটিই করতাম। কিন্তু এটি ঘটেছে খোদা তা'লার নির্দেশে। খোদা তা'লা যেভাবে বুঝিয়েছেন আমি ঠিক সেভাবেই করেছি। বস্তুত চালাকি ও প্রতারণা মানবীয় কূটচক্রের মোকাবিলায় হয়ে থাকে, ঐশী জামা'ত কখনও এগুলোকে ভয় করে না। এ কাজ আমাদের নয়; বরং এটি খোদা তা'লার কাজ। তিনিই এই বাণীকে ছড়িয়ে দেবেন।

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের ঘটনা আমাদের জামা'তের প্রসিদ্ধ ঘটনা। এ ঘটনা সম্পর্কেও জনৈক বিরুদ্ধবাদী মৌলবী, যে সম্ভবত গুজরাতের বাসিন্দা ছিল, সে সবসময় মানুষকে বলতো, মির্যা সাহেবের দাবি শুনে কোনভাবেই বিভ্রান্ত হয়ো না। হাদীসসমূহে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে, ইমাম মাহদীর লক্ষণ হল- তাঁর যুগে রমজান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হয়, আর যতক্ষণ পর্যন্ত রমজান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত না হয়- ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর দাবিকে সত্য মনে করো না। ঘটনাক্রমে তার জীবদ্দশাতেই চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে যায়। তার একজন আহমদী প্রতিবেশী ছিল। তিনি বর্ণনা করেন যে, যখন সূর্যগ্রহণ আরম্ভ হয় তখন সেই মৌলবী বিচলিত অবস্থায় নিজ বাড়ির ছাদে উঠে পায়চারি করতে থাকে। সে পায়চারি করছিল আর বলছিল- 'হুন লোগ গুমরাহ্ হোঙ্গে, হুন লোগ গুমরাহ্ হোঙ্গে'; [বারংবার একথা বলছিল;] অর্থাৎ 'এখন মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে!' সে এটি বুঝতে পারে নি যে, ভবিষ্যদ্বাণী যেহেতু পূর্ণ হয়েছে, তাই মানুষ মির্যা সাহেবকে মান্য করে হেদায়েত লাভ করবে; পথভ্রষ্ট হবে না। খ্রিষ্টানরাও একদিকে স্বীকার করতো যে, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহে বর্ণিত যাবতীয় লক্ষণাবলী পূর্ণ হয়েছে; কিন্তু অন্যদিকে মহানবী (সা.)-এর দাবি শুনে এই কথাও বলতো যে, দৈবক্রমে এখন একজন মিথ্যাবাদীও দাবি করে বসেছে। যেভাবে মুসলমানরা বলে, লক্ষণাবলী পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু ঘটনাচক্রে এখন একজন মিথ্যাবাদী দাবি করে বসেছে। এই হল মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, এমন কাকতাল একজন মিথ্যাবাদীর কপালে জোটে, অথচ সত্যবাদীর কপালে জোটে না!

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অতীত জীবন সম্পর্কে তিনি (রা.) বলেন, প্রত্যেক পাপ পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি হয়। কখনও এমনটি ঘটে না যে, এক ব্যক্তি রাতের বেলা সত্যবাদী অবস্থায় ঘুমোয় আর পরদিন ভোরে উঠে জঘন্যতম মিথ্যাবাদীতে পরিণত হয়; অতীতে সে মানুষের বিষয়েও মিথ্যাচার করতো না, অথচ এখন ঘুম থেকে উঠেই খোদা তা'লা সম্পর্কে মিথ্যাচার করা আরম্ভ করে দেয়! এই নীতি অনুসারে আমরা হযরত মির্যা সাহেবের দাবির পূর্ববর্তী জীবনের দিকে দৃষ্টি দিই। তিনি (আ.) এখানকার হিন্দু সম্প্রদায়, শিখ মতাবলম্বী ও মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বারংবার ঘোষণা দিয়েছেন যে, তোমরা কি আমার (দাবির) পূর্ববর্তী জীবনাচরণের ওপর কোন আপত্তি করতে পারবে? অথচ কারওরই এই স্পর্ধা হয় নি, উল্টো তাঁর (আ.) নিষ্কলুষ চরিত্রের

স্বীকারোক্তি দিতে হয়েছে। মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন বাটালভি, যিনি পরবর্তীতে ঘোর বিরোধীতে পরিণত হন, তিনি নিজের পত্রিকায় তাঁর (আ.) জীবনের পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। আর জনাব জাফর আলী খানের পিতা নিজ পত্রিকায় তাঁর (আ.) প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, তিনি (আ.) অত্যন্ত পবিত্রচেতা ব্যক্তি ছিলেন। অতএব যে ব্যক্তি চল্লিশ বছর পর্যন্ত নিষ্কলুষ ও পবিত্র জীবন যাপন করেছেন, তিনি রাতারাতি কীভাবে ভিন্ন কিছু হয়ে গেলেন এবং বদলে গেলেন? মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত হল, [অর্থাৎ সাইকোলজিস্টরাও বলেন,] যাবতীয় মন্দকর্ম ও চারিত্রিক ত্রুটি ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়; এক নিমিষেই চারিত্রিক পরিবর্তন সাধিত হয় না। অতএব লক্ষ্য করুন! তাঁর (আ.) অতীত জীবন কতটা নিষ্কলুষ, ত্রুটিহীন ও আলোকোদ্ভাসিত ছিল।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে কীভাবে সাহায্য করে গিয়েছেন– এ সম্পর্কে আমরা লক্ষ্য করি যে, তিনি লিখেন, যিনি খোদা তা'লা কর্তৃক প্রেরিত হয়ে থাকেন, তাঁর সাথে ঐশী সাহায্য-সমর্থন থাকে। যদি ঐশী সাহায্য-সমর্থন না থাকে, তবে সে খোদার প্রেরিত বা রসূল নয়। মানুষ তাকে ধ্বংস করে ফেলার উপক্রম করে, কিন্তু ঐশী সাহায্য এগিয়ে আসে ও তাঁকে সাফল্যমণ্ডিত করে এবং তাঁর শত্রুদের যাবতীয় চক্রান্ত ধূলিসাৎ করে দেয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। তাঁকে বিভিন্নভাবে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে; হত্যার জন্য ঘাতক নিযুক্ত করা হয়েছে, যাদের কথা জানাজানি হয়ে যায় ও তারা নিজেদের ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হয়। তাঁর (আ.) বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। বস্তুত মার্টিন ক্লার্ক তাঁর (আ.) বিরুদ্ধে হত্যার মিথ্যা মামলা সাজায় আর এক ব্যক্তি সাক্ষ্যও দেয় যে, আমাকে হযরত মির্যা সাহেব (হত্যাকাণ্ডের জন্য) নিযুক্ত করেছিলেন। সেই ম্যাজিস্ট্রেট, যে ঘোষণা দিয়ে বলেছিল যে, এই মসীহ্ ও মাহ্দী হবার দাবিকারককে আজ পর্যন্ত কেউ ধরে নি কেন? আমি তাকে ধরব! কিন্তু যখন মামলা হয়, তখন সেই ম্যাজিস্ট্রেট-ই বলে, আমার বিবেচনায় এটি মিথ্যা মামলা। বারবার সে একথাই বলেছে আর অবশেষে সেই ব্যক্তিকে খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে পৃথক করে পুলিশ কর্মকর্তার হেফাজতে রাখা হলে সে কান্না শুরু করে আর বলে দেয় যে, খ্রিষ্টানরা আমাকে (মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে) শিখিয়ে দিয়েছিল। এভাবে খোদা তা'লা সেই মিথ্যা অভিযোগকে নস্যাৎ করে দেন।

অনুরূপভাবে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমাদের জামা'তের একজন অত্যন্ত উদ্যমী মুবাল্লেগ হলেন শিমলা-নিবাসী মৌলবী উমর উদ্দীন সাহেব। তিনি নিজের (বয়আত করার) ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তিনিও এই মানদণ্ড যাচাই করে আহমদী হয়েছিলেন। তিনি বলেন, শিমলায় মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন ও মৌলবী আব্দুর রহমান সাইয়্যাহ্ এবং আরও কতিপয় ব্যক্তি শলা-পরামর্শ করছিল যে, এখন মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়? মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেব বলেন, মির্যা সাহেব ঘোষণা দিয়েছেন যে, আমি আর মুবাহেসা করব না। এখন আমরা মুবাহেসার বিজ্ঞাপন দিই; তিনি যদি এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডায়মান হন তবে আমরা বলব, তিনি মিথ্যা বলেছেন; ইতিপূর্বে তিনি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন যে, আমি কারও সাথে মুবাহেসা করব না, অথচ এখন মুবাহেসা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন! আর যদি তিনি মুবাহেসা করতে এগিয়ে না আসেন, তখন আমরা চিৎকার চেঁচামেচি করব যে, দেখ, মির্যা সাহেব পরাজিত হয়েছেন! একথা শুনে মৌলবী উমর উদ্দীন সাহেব বলেন, এসবের কী দরকার আছে! আমি যাচ্ছি আর গিয়ে তাকে হত্যা করে এই ঝামেলা একেবারে শেষ করে দিচ্ছি। মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন সাহেব বলেন, হে ছেলে! তুমি তো জানো না, এসব (চেষ্টা) আগেই করা হয়ে গিয়েছে। মৌলবী উমর উদ্দীন সাহেবের হৃদয়ে এই বিষয়টি দাগ কাটে যে, খোদা যে ব্যক্তির এতটা নিরাপত্তা বিধান করছেন, তিনি (নিশ্চয়) খোদার পক্ষ থেকেই হবেন। তিনি যদিও তরুণ ছিলেন, তবুও তিনি বুঝতে পারেন- আল্লাহ্ তা'লা (তাঁর) এতটা নিরাপত্তা বিধান করছেন যে এত ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও তিনি নিরাপদ রয়েছেন, তাহলে তিনি খোদার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকবেন। অতঃপর তিনি বয়আত করে ফেরত যাবার সময় স্টেশনে মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন বাটালভী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোথা থেকে? উত্তরে তিনি বলেন, কাদিয়ান থেকে বয়আত করে এসেছি। মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন সাহেব বলেন, তুমি তো খুবই দুষ্ট! তোমার বাবার কাছে লিখব! তিনি উত্তরে বলেন, মৌলবী সাহেব! যা কিছু হয়েছে সব আপনার কারণেই হয়েছে। অতএব বিরুদ্ধবাদীরা আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়দের হত্যা করতে চায়, তা সত্ত্বেও তাদেরকে রক্ষা করা হয়। খোদা তাদেরকে নিত্যনতুন জ্ঞানের মাধ্যমে সাহায্য করেন এবং সকল ক্ষেত্রে তাদেরকে সম্মানিত করেন।

অনুরূপভাবে, মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন বাটালভী সাহেবের এই দাবিও ছিল যে, আমি মির্যা সাহেবকে ধ্বংস করে দেব। মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন বাটালভী সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যৌবনের বন্ধু ছিলেন এবং তাঁর সাথে সু-সম্পর্ক রাখতেন ও সর্বদা তাঁর (আ.) রচনার প্রশংসা করতেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবির সাথে সাথেই

তিনি ঘোষণা দেন যে, আমিই এই ব্যক্তিকে উঠিয়েছিলাম, আর এখন আমিই তাকে ধ্বংস করে দেব। আবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আত্মীয়-স্বজনরাও ঘোষণা দেয়, বরং কতিপয় সংবাদপত্রে এই ঘোষণা ছাপিয়েও দেয় যে, এই ব্যক্তি ব্যবসা খুলে বসেছে, তাই তার প্রতি কারও মনোযোগ দেয়া উচিত নয়। আর এভাবে তারা পুরো পৃথিবীতে তাঁর (আ.) বিষয়ে মন্দ ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এটি আমার বোধশক্তি হওয়ার পরের কথা; অনেক কাজের লোকই, চাষাবাদের কাজকর্মে যাদেরকে 'কাম্মি' বলা হয়, তারা তাঁর (আ.) বাড়ির কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায়। [অর্থাৎ যাদেরকে কামলা বলা হতো, চাষাবাদের অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও, এলাকার স্বীকৃত কৃষিজীবি হওয়া সত্ত্বেও তারা তাঁর (আ.) বাড়ির কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায়।] এর পেছনে উস্কানিদাতা আসলে আমাদের আত্মীয়-স্বজনরাই ছিল। মোটকথা, আপন-পর সবাই মিলে তাঁকে (আ.) নিশ্চিহ্ন ও ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু খোদা তাঁর বান্দাকে বলেন, পৃথিবীতে একজন নবী এসেছে, কিন্তু পৃথিবী তাকে গ্রহণ করে নি, তবে খোদা তাকে গ্রহণ করবেন এবং উপর্যুপরি প্রবল আক্রমণসমূহ ডদয়ে তার সত্যতা প্রকাশ করে দিবেন। এক নিঃস্ব ও অসহায় ব্যক্তি কাদিয়ানের মতো গণ্ডগ্রামে, যেখানে সপ্তাহে মাত্র একবার ডাক আসতো, যেখানে একটা প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত ছিল না, যেখানে এক রূপির আটাও মানুষ পেতো না- সেখানে দণ্ডায়মান হন; আর সেই মানুষটিও এমন মানুষ যিনি কোন মৌলবীও না, কিংবা অনেক সহায়-সম্পত্তির মালিকও না; নিঃসন্দেহে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক সম্ভ্রান্ত বংশের মানুষ ছিলেন, কিন্তু রাজা ও নবাবদের মতো বিরাট সহায়-সম্পত্তির মালিক ছিলেন না; তিনি দাঁড়িয়ে জগতের সামনে ঘোষণা করেন এবং প্রথম দিনই বলে দেন যে, খোদা আমার নাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিবেন; আর আজ কে একথা বলতে পারে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে যায় নি? আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবীর এমন কোন প্রান্ত নেই যেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বনামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন নি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, মিথ্যাবাদীর ধ্বংস হওয়ার জন্য তার মিথ্যাচারই যথেষ্ট। কিন্তু যে কাজ আল্লাহ্ তা'লার প্রতাপ এবং তাঁর রসূলের আশিসরাজির প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে হয়ে থাকে এবং তা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার হাতে রোপিত চারা হয়ে থাকে, সেটির সুরক্ষা তো খোদ ফিরিশতারা করে থাকেন। কার সাধ্য আছে যে, সেটিকে ধ্বংস করবে? মনে রেখো, আমার জামা'ত প্রতিষ্ঠা যদি নিছক ব্যবসা হয়ে থাকে, [যেভাবে তারা বলতো যে এটি ব্যবসা;] তবে এর নাম-নিশানাও থাকবে না। কিন্তু যদি এটি খোদার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে এবং নিঃসন্দেহে এটি তাঁরই পক্ষ থেকে, তাহলে সারা পৃথিবীও যদি এর বিরোধিতা করে তবুও এটি বৃদ্ধি পাবে ও বিস্তৃত হবে এবং ফিরিশতারা এর সুরক্ষা বিধান করবে, [ইনশাআল্লাহ্]। যদি একজনও আমার সাথে না থাকে এবং কেউ-ই সাহায্য না করে, তবুও আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, এই জামা'ত সফল হবে, ইনশাআল্লাহ্।"

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সামর্থ্য দিন, আমরা যেন তাঁর (আ.) হাতে বয়আত করার কর্তব্য পালনকারী হই এবং তাঁর বাণীকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়ে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও পুরস্কাররাজির উত্তরাধিকারী হই; অবিশ্বস্তদের দলভুক্ত না হই, বরং বিশ্বস্তদের মধ্যে পরিগণিত হই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সেই সৌভাগ্য দান করুন।

আজ আমি একটি ওয়েবসাইটও উদ্বোধন করব বা এর ঘোষণা করব। এটিও তবলীগের, পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাণী পৌঁছে দেয়ার মাধ্যম। এটি কুর্দি ভাষায় জামা'তের ওয়েবসাইট- islamahmadiyya.krd। এই ওয়েবসাইটের তত্ত্বাবধান করছেন ডা. ইসমাঈল মুহাম্মদ সাহেব, তার সাথে কুর্দি জামা'তের সদস্যদের একটি দলও রয়েছে। এই ওয়েবসাইটের উদ্দেশ্য হল কুর্দি ভাষাভাষী পাঠকরা যেন প্রথমবারের মতো নিজেরা আহমদীয়া জামা'তের বিশ্বাস সম্পর্কে নিজেদের ভাষায় পড়তে পারে- সেই সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া। এই ওয়েবসাইট মূলত কুর্দি ভাষার 'সোরানী' উপভাষায় বানানো হয়েছে, সেইসাথে 'বাদিনী' উপভাষায়ও কিছু বিষয়বস্তু রয়েছে। ওয়েবসাইটটিতে সংবাদ, প্রবন্ধ, তফসীর, বইপুস্তক, জুমুআর খুতবা ও ভিডিও বিভাগ রয়েছে। কুর্দি অনুবাদ কমিটির সহযোগিতায় এই ওয়েবসাইটে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বেশ কিছু সংখ্যক বইসহ অন্যান্য জামা'তী বইপুস্তকও রয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বই রয়েছে, হযরত খলীফা সানীর বই রয়েছে এবং অন্যান্য জামা'তী রচনাবলী রয়েছে, যার মধ্যে ইসলামী নীতিদর্শন, মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ, জরুরতুল ইমাম, হাকীকাতুল মাহদী, দাওয়াতুল আমীর, মানসবে খেলাফত প্রভৃতি রয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা জুমুআর নামাযের পর এই ওয়েবসাইটের উদ্বোধনও হবে। আল্লাহ্ তা'লা একে কল্যাণমণ্ডিত করুন। একইভাবে পৃথিবীতে যে পরিস্থিতি বিরাজমান, সেই বিষয়েও বলতে চাই- দোয়া অব্যাহত রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন এবং মানুষকে সুবুদ্ধি দিন, আর তারা যেন নিজেদের স্রষ্টাকে চিনতে সক্ষম হয়। *(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)*

বিবাহের সময় হযরত আয়েশা (রা.)-এর বয়স কত ছিল?

হযরত আমীরুল মুমিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ ইং একটি অফিসিয়াল সাক্ষাতে মহানবী (সা.)-এর সাথে বিবাহের সময় হযরত আয়েশা (রা.)-এর বয়স কত ছিল এ বিষয়ে বিভিন্ন রেওয়ায়েত (বর্ণনাসমূহ) পর্যালোচনা করে এবং এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতিসমূহ বিশ্লেষণ করার পরে এ বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিতে গিয়ে নিম্নলিখিত বক্তব্য প্রদান করেন। হুযূর (আই.) বলেন,

মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিবাহের সময় হযরত আয়েশা (রা.)-এর বয়সের বিষয়ে ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থসমূহ (তারীখ ও সীরাত) এবং তফসীর ও হাদীসের পুস্তকসমূহে অনেক বিরোধ দেখতে পাওয়া যায়। হুযূর (সা.)-এর সাথে নিকাহের সময় হযরত আয়েশা (রা.)-এর বয়স ৬ বছর থেকে ১৬ বছর এবং বধু বিদায়ের সময় ৯ বছর থেকে ১৯ বছর পর্যন্ত লেখা হয়েছে।

যদিও সিহাহ সিত্তাহ-এর রেওয়ায়েতসমূহে যার মাঝে সহীহ বুখারীর রেওয়ায়েতগুলোও অন্তর্ভুক্ত, হযরত আয়েশা (রা.)-এর বয়স নিকাহের সময় ৬ বছর এবং বিবাহের (বধু বিদায়) সময় ৯ বছর বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু যদি এ সমস্ত রেওয়ায়েতগুলোকে হাদীস শাস্ত্রের নীতিতে (রেওয়ায়েত ও দেরায়েত) পর্যালোচনা করা হয় তাহলে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বয়সের বিষয়ে বর্ণিত এসব রেওয়ায়েত নির্ভরযোগ্যতার মানদণ্ডে সঠিক সাব্যস্ত হয় না।

এ বিষয়ে সিহাহ সিত্তাহ'তে বর্ণিত ২১টি রেওয়ায়েতের মাঝে ১৪টি রেওয়ায়েত হিশাম বিন উরওয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর অন্য রেওয়ায়েতগুলো আবু উবায়দা, আবু সালামা এবং আসওয়াদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। বিস্ময়ের বিষয় হল, ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থসমূহে (তারিখ ও সীরাতে) এত গুরুত্বপূর্ণ ও বিখ্যাত ঘটনা কোন জ্যেষ্ঠ সাহাবী বর্ণনা করেন নি।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর কম বয়সে বিবাহের বিষয়ে রেওয়ায়েত প্রথমবার ১৮৫ হিজরীতে দৃশ্যপটে আসে যখন এ বিষয়বস্তুর অধিকাংশ রেওয়ায়েতের রাবী (বর্ণনাকারী) হিশাম এবং উরওয়ার মৃত্যুর পর একটা দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছিল। আরেকটি বিষয় হল, হিশাম বিন উরওয়া যার জীবনের অধিকাংশ সময় মদীনাতে অতিবাহিত হয়েছে এবং মদীনার বিখ্যাত মুহাদ্দেস ইমাম মালেক তার (হিশাম বিন উরওয়া) একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন। তথাপি তাঁর অর্থাৎ ইমাম মালেকের পুস্তক মুআত্তা ইমাম মালেক– এ উক্ত রেওয়ায়েতের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

শেষ বয়সে যখন হিশাম বিন উরওয়া অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল, (রাবীদের জীবনী নিয়ে পর্যালোচনাকারীদের মতে) তাঁর স্মৃতিভ্রম ও কিছু মানসিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সে সময় তিনি কুফা চলে গিয়েছিলেন। সেখানে প্রথমবার তিনি এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেন। আর যে ব্যক্তির কাছে তিনি বর্ণনা করেন সে তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় চল্লিশ বছর আরও অপেক্ষা করে এবং এরপর এ রেওয়ায়েতকে বর্ণনা করে; যেন উক্ত রেওয়ায়েতকে কোন ধরনের সমর্থন বা প্রত্যাখ্যানের প্রশ্নই উঠতে না পারে।

অতএব মদীনাতে বসবাসকালে হিশামের উক্ত রেওয়ায়েত বর্ণনা না করা এবং তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পর লিখিত পুস্তকে এর উল্লেখ করা এই রেওয়ায়েতের বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করে। এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে, **'আহলে বায়ত'** বিশেষত হযরত আয়েশা (রা.)-এর মর্যাদাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এই রেওয়ায়েত রটনা করা হয়েছে। এ কাজ এজন্য করা হয়ে থাকতে পারে যেন এটা প্রমাণ করা যায় যে, সেই পবিত্র সহধর্মিনী যার বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ ছিল, তাঁর কাছ থেকে ধর্ম শেখ, মহানবী (সা.)-এর সাথে অল্প বয়সে তাঁর বিবাহ হওয়া যখন তিনি বান্ধবী ও পুতুল দিয়ে খেলতেন এমনকি তিনি শৈশবেই ছিলেন যখন মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেন, তাঁর কাছ থেকে কি ধর্ম শেখা যায়?

এছাড়াও সহীহ বুখারী যেখানে এই রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, এর মাঝেও হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকাহের বিষয়ে রেওয়ায়েতসমূহে পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে। একটি রেওয়ায়েতে

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর তিন বছর পর মহানবী (সা.) আমাকে বিয়ে করেন। অথচ অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত খাদিজা (রা.) মহানবী (সা.)-এর মদীনা যাওয়ার তিন বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর মহানবী (সা.) দুই বছর অথবা এর প্রায় কাছাকাছি সময় অপেক্ষা করেন, এরপর হযরত আয়েশা (রা.)-কে বিবাহ করেন।

অতএব, যদিও হাদীস সংকলনকারীরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে উক্ত কাজকে সম্পাদন করেছেন, তথাপি এতে ভুল এবং সন্দেহের দিকটি রয়ে যায়। কেননা এই কাজ মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর প্রায় দেড়শ বা দুইশ বছর পর শুরু হয়েছে, এর মাঝে মুসলমানদের কয়েকটি ফির্কা হয়ে গিয়েছিল এবং কয়েক ধরনের মতবিরোধ তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল।

এ যুগের ন্যায়বিচারক (হাকাম ও আদাল) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অন্যান্য বিষয়ের সংশোধনের মতো এ বিষয়টিও খুব সুন্দরভাবে সমাধান করেছেন। তিনি (আ.) লিখেন,

"যদিও আমরা হাদীসকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে থাকি, কিন্তু যে হাদীস কুরআন করীমের বিপরীত, মহানবী (সা.)-এর সম্মানের বিরোধী হয় সেটা আমরা কীভাবে গ্রহণ করতে পারি? সে সময় হাদীস একত্র করার সময় ছিল। যদিও তারা পর্যালোচনা করে হাদীস একত্রিত করেছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করতে পারেন নি। সেটা ছিল একত্রিত করার সময় কিন্তু এখন যাচাই বাছাই ও পর্যালোচনা করার সময়।" *(মলফুযাত, নবম খণ্ড, পৃ. ৪৭১-৪৭২; সংস্করণ: ১৯৮৪ইং)*

হযরত আয়েশা (রা.)-এর বয়সের বিষয়টি যখন আমরা ভিন্ন আঙ্গিকে পর্যালোচনা করি তখন ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থসমূহে (তারীখ ও সীরাত) আমরা এটাও দেখতে পাই যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর চারজন সন্তানের সবাই (হযরত আব্দুল্লাহ, হযরত আসমা, হযরত আব্দুর রহমান এবং হযরত আয়েশা) মহানবী (সা.)-এর নবুওয়্যতের দাবির পূর্বেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জীবনীগ্রন্থকারকদের (সীরাত) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রাথমিক মুসলমানদের তালিকায় হযরত আয়েশা (রা.)-এর নামও অন্তর্ভুক্ত, যদি হযরত আয়েশা (রা.)-এর জন্ম নবুওয়্যতের পঞ্চম বছর [অর্থাৎ, মহানবী (সা.)-এর নবুওয়্যতের দাবির] হয়ে থাকে তাহলে তাঁর নাম প্রাথমিক মুসলমানদের তালিকায় কীভাবে অন্তর্ভুক্ত হল?

ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন, হযরত আসমা (রা.) বয়সে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে দশ বছরের বড় ছিলেন। আর হিজরতের সময় হযরত আসমা (রা.)-এর বয়স ছিল ২৭ বছর। এ হিসাবেও হযরত আয়েশা (রা.)-এর জন্মসাল নবুওয়্যতের ৪ বছর পূর্বে হয়। আর যদি তাঁর নিকাহ হিজরতের তিন বছর পূর্বে হয়ে থাকে তাহলে সে সময় তাঁর বয়স হয় ১৪ বছর।

উহুদ যুদ্ধ ২ হিজরীতে সংঘটিত হয়। এ বিষয়ে সহীহ বুখারীতে রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) এবং হযরত উম্মে সুলায়েম (রা.) পানির মশক পিঠে বহন করতেন আর লোকদেরকে পানি পান করাতেন। যদি হযরত আয়েশা (রা.)-এর বয়স এতই কম ছিল যে তিনি একটি ছোট মেয়ে ছিলেন, সেক্ষেত্রে তিনি পিঠে পানিভর্তি মশক বহন করে কীভাবে দৌড়ে দৌড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের পানি পান করানোর দায়িত্ব সম্পাদন করেছিলেন? অতএব এটা থেকেও প্রমাণিত হয় যে ২ হিজরীতে তিনি (রা.) এতটুকু বয়সে উপনীত হয়েছিলেন যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে এ ধরনের ভারি কাজ করতে পারতেন।

ইতিহাস গ্রন্থসমূহে (তারিখ) এই ঘটনাও পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.)-এর সাথে বিবাহের পূর্বে জুবায়ের বিন মুতআম (রা.)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বাগদান হয়েছিল। সে সময় তাঁর বাগদান হওয়া প্রমাণ করে যে, তাঁর বয়স ছয় বছর ছিল না। বিশেষত এজন্য যে, যখন মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিবাহের প্রস্তাব পেলেন, তখন হযরত আবু বকর (রা.) জুবায়ের বিন মুতআম (রা.)-কে হযরত আয়েশা (রা.)-কে উঠিয়ে নেয়ার বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। অপর পক্ষ থেকে নেতিবাচক উত্তর আসলে এই সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। এরপর মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকাহ হয়। জুবায়ের বিন মুতআম (রা.)-কে হযরত আবু বকর (রা.)-এর বধু তুলে নেয়ার প্রস্তাব দেয়া প্রমাণ করে যে, হযরত আয়েশা (রা.)-এর বয়স সে সময় ছয় বছর কোনোভাবেই ছিল না। বরং সে সময়েও তিনি বিবাহের বয়সে উপনীত হয়েছিলেন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) নিজ গবেষকসুলভ বৈশিষ্ট্যে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বয়সের বিষয়ে বর্ণিত বিভিন্ন রেওয়ায়েতগুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করার পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তদনুযায়ী তিনি বিবাহের সময় হযরত আয়েশা (রা.)-এর বয়স ১৩/১৪ বছর নির্ধারণ করেছেন। আর এটাই সঠিক বয়স। সে হিসেবে মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সময় হযরত আয়েশা (রা.)-এর বয়স ২১/২২ বছর হয় যা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের পূর্ণতা এবং লোকদেরকে শেখানোর সর্বোত্তম বয়স।

এ যুগের ন্যায়বিচারক (হাকাম ও আদাল) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর সাথে বিবাহের সময় হযরত আয়েশা (রা.)-এর নয় বছর বয়স সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন। একজন ইসলাম বিরোধী পাদ্রী ফতেহ মসীহ্-এর আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেন,

"আপনি আনুষ্ঠানিক বিবাহের সময় হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর বয়স নয় বছর ছিল বলে লিখেছেন। প্রথমতঃ নয় বছর বয়সের উল্লেখ মহানবী (সা.) থেকে সাব্যস্ত নয়। আর না এ বিষয়ে কোন ওহী হয়েছে আর না বহুল প্রচলিত রেওয়ায়েতের ধারাক্রম দিয়ে সাব্যস্ত হয় যে, অবশ্যই নয় বছর বয়স ছিল। শুধুমাত্র একজন বর্ণনাকারী (রাবী) থেকে উদ্ধৃত।" *(নূরুল কুরআন-২, রূহানী খাযায়েন নবম খণ্ড, পৃ. ৩৭৭)*

একইভাবে আরেক স্থানে হুযূর (আ.) লিখেন, "হযরত আয়েশা (রা.)-এর নয় বছর বয়সের বিষয়টি ভিত্তিহীন বর্ণনায় এসেছে। কোনো হাদীস বা কুরআন দিয়ে সাব্যস্ত নয়।" *(আরিয়া ধারম, রূহানী খাযায়েন, দশম খণ্ড, পৃ. ৬৪)*

সারাংশ হল, সে সমস্ত রেওয়ায়েত যাতে বিবাহের সময় হযরত আয়েশা (রা.)-এর বয়স নয় বছর বর্ণিত হয়েছে সেগুলো যাচাই-বাছাই এবং পর্যালোচনার দাবি রাখে। এ সমস্ত রেওয়ায়েতে হয় বর্ণনাকারীদের (রাবী) অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়েছে অথবা পরবর্তি বর্ণনাকারীগণ (রাবী) নিজেদের পক্ষ থেকে যোগ করেছেন।

ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থসমূহে (তারীখ ও সীরাত) মনোযোগ দিলে স্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হয় যে, হযরত আয়েশা (রা.)-এর বয়স বিবাহের সময় একটি গ্রহণযোগ্য বয়স ছিল, যে বয়সে কুরায়েশরা সাধারণত নিজেদের মেয়েদের বিয়ে দিত। এই বিয়ে সে সময় আরব সমাজেও কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিল না, আর না এমন আপত্তিকর বিষয় এতে ছিল যে, মুনাফেক ও কাফেররা একে আপত্তি অথবা তিরস্কার কিংবা বিস্ময়ের আঙ্গুল তুলতে পারে।

*(**ভাবানুবাদ:** মাওলানা নাভিদুর রহমান, মুরব্বী সিলসিলা)*

[(তথ্যসূত্র: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১। https://www.alfazl.com/2021/02/05/48178)
(সাপ্তাহিক আল-হাকাম ২০ জানুয়ারি ২০২১। https://www.alhakam.org/how-old-was-hazrat-aisha-ra-at-the-time-of-her-marriage/)]

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

"পাক্ষিক আহ্‌মদী" পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক-চাঁদা বাকি পড়েছে। তাই অনুগ্রহপূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক-চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহ্‌মদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন: **ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।**

মোবাইল নং- ০১৭৩৬-১২৪৭০৪, প্রয়োজনে গ্রাহক-চাঁদা ০১৯১২৭২৪৭৬৯ নম্বরে বিকাশ করতে পারেন। ওয়াসসালাম।

খাকসার
সেক্রেটারি ইশায়াত
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেছেন,

"তোমরা ভালভাবে স্মরণ রাখবে, তোমাদের সমস্ত উন্নতি খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত। যেদিন তোমরা এ কথা বুঝতে অক্ষম হবে এবং খেলাফতকে কায়েম রাখবে না, সেদিন তোমাদের ধ্বংস ও সর্বনাশের দিন হবে। আর যদি তোমরা এ সত্যকে অনুধাবন করো এবং খেলাফতের এ নেযামকে কায়েম রাখ, তাহলে সমগ্র পৃথিবী যদি সম্মিলিতভাবে তোমাদেরকে ধ্বংস করতে চায়, তবুও তারা তা পারবে না। তোমাদের বিপরীতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হয়ে থাকবে। যতদিন তোমরা একে (নেযামে খেলাফতকে) দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে ততদিন পৃথিবীর কোন বিরোধিতাই কার্যকর হবে না।" *(দরসে কুরআন, পৃষ্ঠা: ৭৩, প্রকাশিত ১৯২১ইং)*

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১৫ জানুয়ারি ২০২২

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, নাইজেরিয়া

"একজন আহমদী মুসলমানের মাঝে ইসলামের শিক্ষার প্রকৃত প্রতিফলন হওয়া উচিত"

- হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)

গত ৯ জানুয়ারি ২০২২ আহমদীয়া মুসলিম স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন নাইজেরিয়ার সদস্যদের সঙ্গে একটি ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে MTA ইন্টারন্যাশনাল স্টুডিও থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর আহমদীয়া মুসলিম স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন নাইজেরিয়ার ৩০ এর অধিক সদস্য নাইজেরিয়ার লাগোসের ওজোকোরোতে অবস্থিত লাজনা হল থেকে সভায় ভার্চুয়ালি (অনলাইনে) সংযুক্ত হন।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত দিয়ে শুরু হওয়া একটি আনুষ্ঠানিক অধিবেশনের পর উপস্থিত শিক্ষার্থীগণ হুযূর আকদাসকে তাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও সমসাময়িক বিষয়াদি নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করেন।

একজন খাদেম হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, কীভাবে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের সচরাচর দেখা দেওয়া কদর্যতা ও অনৈতিকতাসমূহ হতে অন্যান্য খোদ্দামদের দূরে রাখতে পারেন।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"একজন আহমদী মুসলমানের মাঝে ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত প্রতিফলন হওয়া উচিত আমাদের সদস্যদের 'বয়আতের শর্তসমূহ' নামক বইটি প্রদান করে ইসলাম-আহমদীয়াতের সঙ্গে তাদের বন্ধনকে স্মরণ করাতে থাকো। তাদেরকে বলো, এ সকল শর্তাবলী মেনেই তুমি ইসলাম-আহমদীয়াতকে গ্রহণ করেছো এবং তুমি অঙ্গীকারবদ্ধ যে, তুমি ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিবে। বর্তমান যুগে এটি একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ অনুকূল নয়, তবুও আহমদী মুসলমান শিক্ষার্থীদের অবশ্যই এগুলো এড়িয়ে চলতে হবে।"

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"সুতরাং, আমাদের শিক্ষার্থীরা যদি এ বিষয়গুলো বুঝতে পারে তাহলে তারা

নিজেদের পরিবর্তন করতে চেষ্টা করবে। দেখো! আমরা পৃথিবীকে পরিবর্তন করতে এসেছি, আমরা দাবি করি আমরা পৃথিবীর সংস্কার করবো। যদি আমরা নিজেরাই এসব খারাপ কাজে নিমজ্জিত হয়ে পড়ি তাহলে কীভাবে আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবো? খোদ্দামুল আহমদীয়ার অঙ্গীকারে তোমরা বলে থাকো 'আমি সব কিছু ত্যাগ করবো'। তুমি যদি তোমার আবেগকে ত্যাগ করতে না পারো, ইসলামের শিক্ষার চর্চা না করো, তাহলে কীভাবে তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ করবে? সুতরাং প্রত্যেক খাদেমকে উপলব্ধি করাতে চেষ্টা করো– এটি তোমার অঙ্গীকার, এটি আমাদের সীমা। এগুলো হচ্ছে আনুগত্যের অঙ্গীকারের শর্তাবলী এবং আমাদেরকে এগুলো পূর্ণ করতে হবে যেন আমরা নিজেদের সংশোধন করতে পারি এবং জাতির সংশোধন করতে পারি। তখন দেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। অন্যথায়, আমরা যদি এমন আচরণ করি তখন মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং আমাদেরকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, পরিশেষে আমাদের এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে এবং পরকালে এর পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। তাদেরকে তোমার এ বিষয়গুলো উপলব্ধি করাতে হবে। তারা যদি এটি বুঝে নেয় তাহলে তো খুবই ভাল, অন্যথায় তোমার দায়িত্ব কেবল উপদেশ দেয়া। তাদেরকে উপদেশ প্রদান করতে থাকো।"

অপর একটি প্রশ্ন ছিল যারা শুনতে আগ্রহী নয় তাদের নিকট আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বার্তা পৌঁছে দেয়া সম্পর্কিত।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) উপদেশ প্রদান করেন এবং বলেন:

"আল্লাহ্ তা'লা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বলেছেন যে, তুমি বলপ্রয়োগ করে তোমার বার্তা পৌঁছাতে পারবে না। যারা তোমার কথা শুনছে না তাদেরকে ছেড়ে দাও। যারা নৈতিক দিক থেকে ভাল এবং পবিত্র প্রকৃতির তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলো। যখন তারা তোমার বন্ধু হয়ে উঠবে তখন তাদেরকে বলো তুমি কে, আহমদীয়া মুসলিম জা'মাত কী এবং কেন আমরা ইসলাম-আহমদীয়াতে বিশ্বাস করি। সুতরাং এটি হল তাদের কাছে প্রচারের উপায়। অন্যথায় তুমি কাউকে তোমার কথা শুনানোর জন্য বলপ্রয়োগ করতে পারো না।"

একজন অংশগ্রহণকারী হুযূর আকদাস (আই.)-কে প্রশ্ন করেন কীভাবে তারা ধর্মীয় কার্যাবলী ও জাগতিক শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"তোমার সর্বপ্রথম ধর্মীয় কাজ হল প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা। ফজরের নামাযের জন্য জাগ্রত হও এবং তোমার ফজরের নামায আদায় করো। এরপর কুরআন তেলাওয়াত করো এবং তোমার স্কুল, কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুতি নাও। তোমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬ বা ৭ ঘণ্টা কাটানোর পর, যখন তুমি ফিরে আসবে, তোমার শিক্ষকবৃন্দ যদি কোনো পড়া বা বাড়ির কাজ দিয়ে থাকেন তাহলে সেটি সম্পন্ন করবে এবং এরপর যদি সময় থাকে তাহলে ধর্মীয় পুস্তকাদি পড়ে জ্ঞান বৃদ্ধির চেষ্টা করবে। জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি এগুলো তোমার চিন্তা-ভাবনাকে পরিবর্তন করবে। তুমি নিজেকে পরিবর্তন করতে চেষ্টা করবে এবং আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবে ভাল হতে চেষ্টা করবে। স্বেচ্ছাশ্রমের ক্ষেত্রে, তুমি যদি প্রতিদিন খোদ্দামুল আহমদীয়ার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে না পারো তাহলে অন্তত তোমার ছুটির দিনগুলোতে আহমদীয়া মুসলিম জা'মাতের কার্যক্রমসমূহে অংশগ্রহণ করতে চেষ্টা করবে। কিন্তু একজন শিক্ষার্থী হিসেবে তোমাকে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, তোমার প্রথম দায়িত্ব পড়াশোনায় মনোনিবেশ করা। পাশাপাশি, কখনও প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্তের নামায ও কুরআন তেলাওয়াত পরিত্যাগ করবে না"।

Smile Aid
your complete dental healthcare

Oral & Dental Surgery
Dental Fillings
Root Canal Treatment
Dental Crowns, Bridges
Teeth Whitening
Dental Implant
Orthodontics (Braces)
In-House Dental X-RAY

Consultation Days :: Tuesday - Friday
For Appointment :: 01703 720 606
https://goo.gl/maps/UjX3RdaVzJ22
fb.me/DrSmileAid

Dr. Nazifa Tasnim
Chief Consultant
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg. No. : 4299
BDS (DU), PGT (BSMMU)
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces

Smile Aid
444, Kuwaiti Mosque Road
(Apollo Hospital-DhakiBari Link Road)
Shahid Muktijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban
Adjacent to Basundhara R/A, Block A (Dhali Bari Pocket Gate)
Vatara, Dhaka - 1212

Consultation Days :: Saturday - Monday
For Appointment :: 01996 244 087
01778 642 471

Consultant
Holy-Lab Hospital & Diagnostic Center
KumarShil Mor, Brahmanbaria

বিবাহ সংবাদ

কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ

নবদম্পতির জন্য মহানবী (সা.)-এর দোয়া

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

"আল্লাহ্ তোমাকে আশিসের ভাগী করুন, তোমার প্রতি অঢেল আশিস বর্ষণ করুন আর তোমাদের উভয়কে পুণ্যকর্মে এক করে দিন" (আমীন)। *(আবু দাউদ, হাদীস নং: ২১৩০)*

- গত ১৩/০৫/২০২২ ফারহাদ আক্তার শ্রাবণী, পিতা: নাইম আহমেদ, কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর-এর সাথে ফিরোজ আহমদ খন্দকার, পিতা: ফারুক আহমদ খন্দকার, ইয়র্ক অনটেরিও, কানাডা-এর বিবাহ ৭,০০,০০০/= (সাত লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। **রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২০২১-২২/৬৮**

- গত ০৩/০৫/২০২২ সাদিয়া আক্তার সনি, পিতা: সাদেক আহমদ, কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে পিয়েল আহমেদ রনি, পিতা: আলফাজ আহমদ, কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিবাহ ২,৫০,০০০/= (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। **রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২০২১-২২/৭১**

- গত ১৩/০৫/২০২২ সাবা নাসের মিমি, পিতা: নাসের আহমদ, ৪৬, কাটা পাহাড় লেন, টেরি বাজার চট্টগ্রাম-এর সাথে সুরুজ আহমদ খন্দকার, পিতা: ফারুক আহমদ খন্দকার, ইয়র্ক অনটেরিও, কানাডা-এর বিবাহ ৭,০০,০০০/= (সাত লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। **রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২০২১-২২/৬৯**

- গত ২৫/০৫/২০২২ তানিয়া খাতুন (রূপা), পিতা: হাফিজুর রহমান, বড় ভেটখালি, যতীন্দ্রনগর, (সুন্দরবন), সাতক্ষীরা-এর সাথে শুভ, পিতা: রাশিদুল মোড়ল, মিরগাং, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২০২১-২২/৭২

- গত ১২/০৭/২০১৯ নুসরত জাহান তমা, পিতা: শফিক আহমদ ভূইয়া, কোড্ডা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, (বর্তমান কান্দিপাড়া)-এর সাথে ইব্রাহীম আহমদ হাজারী, পিতা: তৌহিদ মিয়া হাজারী, ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিবাহ ২,৫০,০০০/= (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২০২১-২২/৭০

- গত ২০/০৫/২০২২ শাবানা পারভীন, পিতা: মরহুম আব্দুস সাদেক তরফদার, বড় ভেটখালী, পোঃ যতীন্দ্রনগর (সুন্দরবন) শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর সাথে টি. এম. তৌহিদুল ইসলাম, পিতা: টি.এম. নজরুল ইসলাম, গোলখালি, চোরামুখা, কয়রা, খুলনা-এর বিবাহ ১,২০,০০০/= (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২০২১-২২/৭৩

New Vol. No. 85 | 1st Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

15th July, 2022 | Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

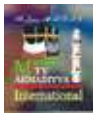

MTA-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

MTA-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) **শুক্রবার:** বাংলাদেশ সময় **সন্ধ্যা ৭:০০ সরাসরি সম্প্রচার।** পুনঃপ্রচার **রাত ১০:২০** এবং **ভোর ৪:০০।**

(২) **শনিবার:** পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় **সকাল ৮:১০** এবং **বিকাল ৫:০০।**

(৩) **রবিবার:** পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় **সন্ধ্যা ৭:০০।**

(৪) **বৃহঃবার:** একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় **রাত ৮:০০।**

50% OF SMALL BUSINESSES AREN'T USING SOCIAL MEDIA PROPERLY TO PROMOTE THEIR BUSINESS.

TO KEEP AHEAD OF THE CURVE, YOU NEED -

* DIGITAL MARKETING STRATEGY
* PROMOTIONAL VIDEO
* FACEBOOK PROMOTION
* PRODUCT PHOTOGRAPHY
* PRODUCT VIDEOGRAPHY

STUDIO ENTERTAINMENT REIMAGINED
JUNCTION

Find us on
STUDIOJUNCTIONBD

Dental Care

ডাঃ মোঃ সাদিউল রাফি
বি. ডি. এস (ঢাকা),
পিজিটি (ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারী)
শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
বিএমডিসি রেজিঃ নং-৪৬৩৩, **মোবাঃ ০১৯২০-১৫৯১৯৭**

ওরাল এন্ড ডেন্টাল সার্জন

চেম্বার ঃ
ডাঃ রাফি ওরো-ডেন্টাল সার্জারী
১২৫৭, বাগানবাড়ী মোড় (পানির পাম্প সংলগ্ন),
পূর্ব জুরাইন, ঢাকা-১২০৪

সাক্ষাতের সময়:
বিকাল ৫টা - রাত ৯টা (মঙ্গল - শুক্রবার)

সিরিয়ালের জন্য: ০১৭১০-৭৭৬৮৬৫

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর পঞ্চম খলীফা
হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর কতিপয় বক্তৃতা ও পত্রের সংকলন-এ

"বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ"

পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ (ইংরেজি পঞ্চম সংস্করণের অনুবাদ) আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ প্রকাশ করেছে।

পুস্তকটির অনুবাদের কাজটি করেছেন প্রফেসর আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক। প্রথম সংস্করণের অংশে আরো যাদের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল তা প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বর্ণিত আছে। বইটির অনুবাদ, কম্পোজ, সম্পাদনা, প্রুফ-রিডিং, মুদ্রণ প্রভৃতি কাজে সম্পৃক্তদের আল্লাহ্ তা'লা উত্তম পুরস্কার দান করুন। নিজ নিজ কপি সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

Printed and Published by **Ahmadiyya Art Press,** 4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
on be half of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Sheikh Mostafizur Rahman**
Phone: +880-2-57300808, 57300849, Fax: +880-2-57300880, E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)